দেববাণী

স্বামী বিবেকানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক

স্বামী আত্মবোধানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন

বাগবাজার, কলিকাতা

মুদ্রাকর

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সপ্তম সংস্করণ

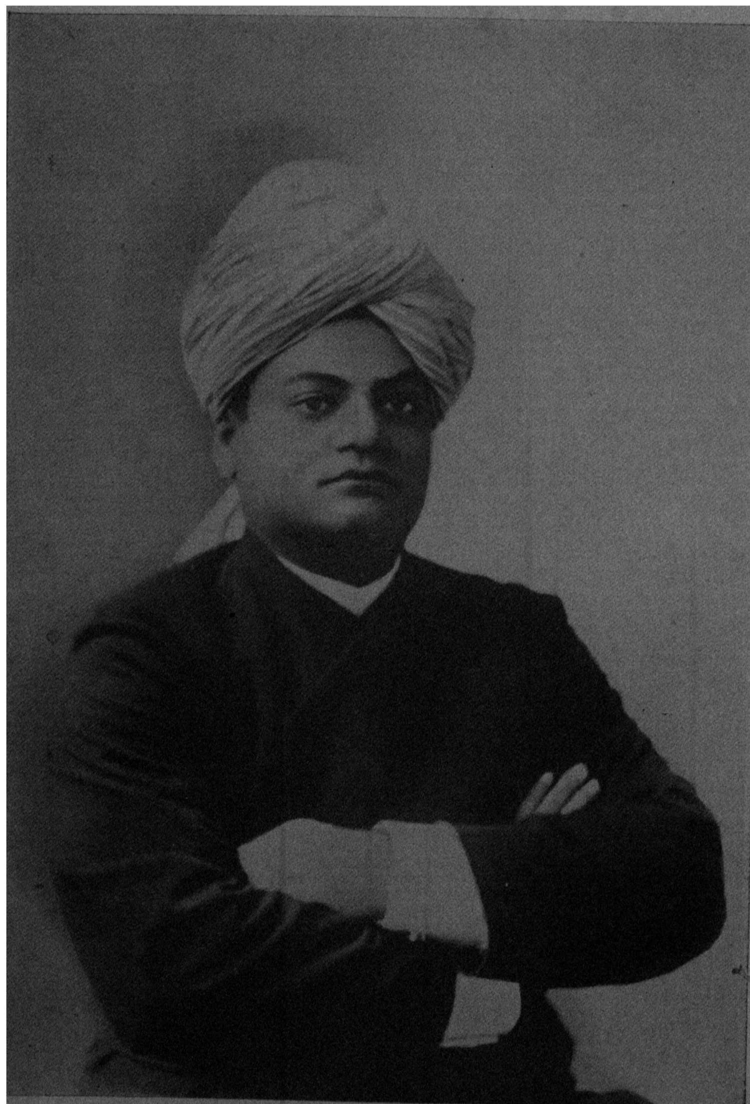
১৩৬০

দুই টাকা

নিবেদন

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় ক্রমাগত বক্তৃতার পর বক্তৃতা-দানে ক্লান্ত হইয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য নিউইয়র্ক হইতে কিয়দ্দূরবর্ত্তী সহস্রদ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park) নামক স্থানে নির্জ্জনবাস করেন। কয়েকজন আমেরিকাবাসী তাঁহার উপদেশে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা ঐ সুযোগে সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকট বাস করিয়া বিশেষভাবে সাধনভজন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজি তথায় প্রতিদিন প্রাতে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার কিছু কিছু তাঁহার জনৈক শিষ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে 'Inspired Talks' নামে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান পুস্তকখানি উহারই বঙ্গানুবাদ।

ইতি অনুবাদকস্য



আমেরিকায় স্বামীজি

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এক তরুণবয়স্ক হিন্দু সন্ন্যাসী ভ্যাঙ্কুভারে পদার্পণ করিলেন। তিনি চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় যোগদান করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সর্ব্বজনপরিচিত ধর্ম্মসংঘের নিয়োগ-প্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে নহে। কেহ তাঁহাকে চিনিত না, এবং তাঁহার নিজের সাংসারিক জ্ঞানও অল্প ছিল; তথাপি মাদ্রাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাঁহাকেই এই মহৎ কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়াছিল; কারণ, তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে, অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা তিনিই ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের যোগ্যতর প্রতিনিধি হইতে পারিবেন এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিল। এই অর্থ এবং দুই একজন দেশীয় নরপতি যাহা দান করিয়াছিলেন, তাহাই সম্বল করিয়া তরুণ সন্ন্যাসী—তদানীন্তন অপরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ—এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এরূপ একটি মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করিতে তাঁহাকে বিপুল সাহস অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ভারতের পুণ্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশযাত্রা করা হিন্দুর নিকট কত গুরুতর ব্যাপার তাহা পাশ্চাত্ত্যবাসী আমাদের ধারণাতীত। সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে একথা বিশেষ করিয়া খাটে; কারণ, জীবনের ব্যবহারিক জড়প্রধান অংশের সহিত তাঁহাদের সমগ্র

শিক্ষাদীক্ষার কোনই সম্পর্ক নাই। টাকা-কড়ি লইয়া নাড়াচাড়া করার, অথবা নিজের পায়ে ভিন্ন অপর কোন উপায়ে ভ্রমণ করার অভ্যাস না থাকায় স্বামীজি এই সুদীর্ঘ পথের প্রত্যেক অংশে প্রতারিত হন এবং লোকে তাঁহার অর্থ অপহরণ করে। অবশেষে যখন তিনি চিকাগো পৌঁছিলেন, তখন প্রায় কপর্দ্দকশূন্য। তিনি সঙ্গে কোন পরিচয়পত্র আনেন নাই, এবং এই বিরাট নগরীতে কাহাকেও চিনিতেন না।* এইরূপে স্বদেশ হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যবধানে অপরিচিতগণের মধ্যে একাকী বাস করা একজন দৃঢ়চেতা ব্যক্তিরও হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে; কিন্তু স্বামীজি এ সমস্ত ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার দৃঢবিশ্বাস ছিল যে ভগবানের কৃপা তাঁহাকে সতত রক্ষা করিবেই করিবে।

প্রায় এক পক্ষ কাল তিনি তাঁহার হোটেলের কর্ত্তা ও অন্যান্য লোকের অত্যধিক দাবী পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সামান্য অর্থ ছিল তাহা এখন এত কমিয়া গিয়াছিল যে, তিনি বেশ বুঝিলেন, যদি তিনি রাস্তায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ এমন একটি স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে, যেখানে থাকিবার খরচ অপেক্ষাকৃত কম। যে মহৎ কার্য্যভার তিনি এরূপ সাহসের সহিত গ্রহণ

---

* পরে জনৈক মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ চিকাগো-নিবাসী এক ভদ্রলোককে স্বামীজির সম্বন্ধে লিখেন, এবং ইনি এই হিন্দু যুবককে নিজ পরিবারে স্থান দান করেন। এইরূপে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, তাহা স্বামীজি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। পরিবারভুক্ত সকলেই স্বামীজিকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার অপূর্ব্ব সদ্গুণরাজির গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও সরলতার সমাদর করিতেন। এই সকল সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায়ই প্রীতি ও আগ্রহের সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন।

করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহাব পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইল। মুহূর্ত্তের জন্য নৈরাশ্য ও সন্দেহের একটি ঢেউ তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল এবং তিনি এই ভাবিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে লাগিলেন, কেন তিনি নির্ব্বোধের মত সেই সকল মাথা-গরম মাদ্রাজী স্কুলের ছোঁড়াদের কথা শুনিয়াছিলেন ? তথাপি উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে টাকার জন্য তার করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বোষ্টন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু যাঁহার উপর তিনি এত দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। রেলগাড়ীতে এক বর্ষীয়সী মহিলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং তিনি তাঁহার আগ্রহ উদ্বোধিত করিতে এতদূর সমর্থ হইলেন যে, সেই মহিলা তাঁহাকে নিজ আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এইখানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইল। ইনি একদিন স্বামীজির সহিত নির্জ্জনে চারি ঘণ্টা কাল একত্র থাকিবার পর তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন চিকাগো ধর্ম্ম-সভায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গমন কবিতেছেন না ?"

স্বামীজি তাঁহার অসুবিধাগুলি বুঝাইয়া দিলেন ; বলিলেন যে, তাঁহার অর্থও নাই এবং উক্ত মহাসভাসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নামে পরিচয়পত্রও নাই। অধ্যাপক অমনি উত্তর দিলেন, "শ্রীযুক্ত বনি আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাঁহার নামে এক পত্র দিব।" এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লিখিয়া ফেলিলেন এবং তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথাও লিখিয়া দিলেন, "দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু আমাদের সকল পণ্ডিতগণকে একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশী পণ্ডিত।" এই পত্রখানি এবং

অধ্যাপক-প্রদত্ত একখানি টিকিট লইয়া স্বামীজি চিকাগো প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নির্ব্বিবাদে প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

অবশেষে মহাসভা খুলিবার দিন সমাগত হইল, এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য প্রতিনিধিগণের শ্রেণীমধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া প্রথম দিবসের অধিবেশনে সভামঞ্চে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, কিন্তু সেই বিরাট শ্রোতৃসংঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র এক আকস্মিক উদ্বেগ তাঁহাকে অভিভূত করিল। অপর সকলে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন; তাঁহার কিছুই ছিল না। সেই ছয় সাত সহস্র নরনারীর বিপুল সংঘকে তিনি বলিবেন কি? সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া তিনি তাঁহার পরিচয়ের পালা আসিলেই ক্রমাগত উহা পিছাইয়া দিতে লাগিলেন, প্রতিবারই সভাপতি মহাশয়ের কানে কানে বলিতে লাগিলেন, "আর কাহাকেও অগ্রে বলিতে দিন।" অপরাহ্ণেও এইরূপ হইল। অবশেষে প্রায় পাঁচটার সময় ডাক্তার ব্যারোজ মহোদয় উঠিয়া তাঁহাকেই পরবর্ত্তী বক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এই ঘোষণা বিবেকানন্দের স্নায়ুমণ্ডলীর স্থিরতা সম্পাদন করিয়া তাঁহার সাহস উদ্বোধিত করিয়া দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্রোপযোগী কার্য্য করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বক্তৃতা দিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, বিশেষতঃ বহু শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়া তাঁহার জীবনে এই প্রথম, কিন্তু ফল হইল তাড়িত-শক্তির ন্যায়। সেই সাগরোপম সহস্র উৎসুক নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার শক্তি ও বাগ্মিতা পূর্ণভাবে জাগরিত হইয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার মধুনিস্যন্দী কণ্ঠে শ্রোতৃবর্গকে 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সিদ্ধি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার করতলগত হইল, এবং যতদিন

মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল ততদিন তাঁহার আদর একদিনের জন্যও কমে নাই। সকলে বরাবর তাঁহার কথা অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহারই বক্তৃতা শুনিবাব জন্য গরমেব দিনেও দীর্ঘ অধিবেশনের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কবিতেন।

ইহাই তাঁহার যুক্তরাজ্যে কার্য্যেব প্রারম্ভ। মহাসভার কার্য্য শেষ হইলে স্বামীজির নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি বক্তৃতা-কোম্পানীব (Lecture Bureau) অনুরোধে তাহাদের পক্ষ হইতে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম অংশে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে স্বীকৃত হন। বহু শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেও তিনি শীঘ্রই এই অপ্রীতিকর কার্য্য পরিত্যাগ কবেন। তিনি এখানে ধর্ম্মাচার্য্যরূপে আসিয়াছেন, ঐহিক বিষয়ে সুবক্তা হিসাবে নহে। সুতবাং এটি অতি লাভজনক ব্যাপার হইলেও তিনি শীঘ্রই উহা পরিত্যাগ করিলেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তাঁহাব প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য নিউ-ইয়র্কে আগমন কবিলেন। চিকাগোয় অবস্থানকালে যাঁহাদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, প্রথমে তাঁহাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ ধনাঢ্য শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহাদেরই বৈঠকখানায় বক্তৃতা কবিতেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি লোকের মনে যে অনুরাগ উৎপাদন করিয়াছেন, উহা তিনি যাহা চাহেন, তাহা নহে; উহা অত্যন্ত ভাসাভাসা জিনিস, অতিমাত্রায় আমোদপ্রিয়তা মাত্র। এই জন্য তিনি নিজের একটি স্থান নির্দ্ধারিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, যেখানে ধনী নির্ধন—সকল অনুরাগী সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে আসিতে পারিবেন।

ব্রুক্লীন নীতিসভার সমক্ষে একটি বক্তৃতায় তাঁহার এইরূপে নিজের ভাবের শিক্ষা দিবার পথ সুগম করিয়া দিল। এই সভার অধ্যক্ষ ডাক্তার লিউইস্ জি, জেন্‌স্ এই হিন্দু যুবা-সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্ষমতায় ও পশ্চিম-গোলার্দ্ধবাসী আমাদের নিকট তাঁহার উপদেশবাণী দ্বারা এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে উক্ত সভার সমক্ষে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিন—নীতিসভার অধিবেশনগৃহ 'পাউচ্ প্রাসাদ' লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল—'হিন্দুধর্ম্ম'। স্বামীজি যখন লম্বা আল্‌খাল্লা ও পাগড়ীতে সজ্জিত হইয়া তাঁহার মাতৃভূমির প্রাচীন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন লোকের আগ্রহ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, বক্তৃতান্তে ব্রুক্লীনে যাহাতে নিয়মিত ক্লাস হয়, তজ্জন্য লোকে বিশেষ জেদ করিতে লাগিল। স্বামীজি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে সম্মতি দিলেন এবং পাউচ্ প্রাসাদে ও অন্যত্র কতকগুলি নিয়মিত ক্লাসের অধিবেশন ও সর্ব্বসাধারণসমক্ষে কতিপয় বক্তৃতা হইল।

ব্রুক্লীনে যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন, তিনি নিউ-ইয়র্কের যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় এই সময়ে যাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীর তেতলায় সামান্য একটি ঘরে তিনি থাকিতেন, এবং ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া যখন তত্রত্য চৌকীখানি ও চেয়ারগুলিতে আর স্থান-সঙ্কুলান হইল না, তখন ছাত্রগণ কতক দেরাজের উপর, কতক কোণের মার্ব্বেল পাথরের হাত-মুখ ধুইবার উঁচু জায়গায়, আর কতক বা মেজেতেই বসিতে লাগিলেন। স্বামীজি নিজেও তাঁহার স্বদেশের

প্রথামত মেজেতেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আগ্রহবান্ শিষ্যগণকে বেদান্তের মহাসত্যগুলি শিক্ষা দিতেন।

এতদিনে তিনি বুঝিলেন যে, স্বীয় আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল ধর্ম্মের সত্যতা ও মৌলিক একত্ব-প্রতিপাদক উপদেশবাণী পাশ্চাত্ত্য জগতের নিকট প্রচাব কবারূপ নিজ অভীপ্সিত মহাকার্য্যে তিনি কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন। ক্লাসটি এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল যে, আর উপরের ছোট ঘরটিতে স্থান হয় না, সুতরাং নীচেকার বড় বৈঠকখানাদ্বয় ভাড়া লওয়া হইল। এইখানেই স্বামীজি সেই ঋতুটির শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিনা বেতনে প্রদত্ত হইত; প্রয়োজনীয় ব্যয়, স্বেচ্ছায় যিনি যাহা দান করিতেন, তাহাতেই চালাইবার চেষ্টা করা হইত। কিন্তু সংগৃহীত অর্থ ঘরভাড়া ও স্বামীজির আহারাদি ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় অর্থাভাবে ক্লাসটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অমনি স্বামীজি ঘোষণা করিলেন যে, ঐহিক বিষয়ে তিনি সর্ব্বসাধাবণসমক্ষে কতকগুলি নিয়মিত বক্তৃতা দিবেন। ইহাদের জন্য পারিশ্রমিক লইতে তাঁহার বাধা ছিল না, সেই অর্থে তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্লাসটি চালাইতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুদের চক্ষে শুধু বিনামূল্যে শিক্ষা দিলেই ধর্ম্মব্যাখ্যার কর্ত্তব্য শেষ হইল না, সম্ভবপর হইলে তাঁহাকে এই কার্য্যের ব্যয়ভারও বহন করিতে হইবে। পূর্ব্বকালে ভারতে এমনও নিয়ম ছিল যে, উপদেষ্টা শিষ্যগণের আহার ও বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করিবেন।

ইতোমধ্যে কতিপয় ছাত্র স্বামীজিব উপদেশে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যাহাতে তাঁহারা পরবর্ত্তী গ্রীষ্ম ঋতুতেও ঐ শিক্ষা-লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্য সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু তিনি একটি

ঋতুর কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং পুনরায় গ্রীষ্মের সময় ঐরূপ পরিশ্রম করা সম্বন্ধে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। তারপর অনেক ছাত্র বৎসরের ঐ সময়ে শহরে থাকিবেন না। কিন্তু প্রশ্নটির আপনা আপনিই মীমাংসা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে একজনের সেণ্টলরেন্স্ নদীবক্ষস্থ বৃহত্তম দ্বীপ 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' (Thousand Island Park) একখানি ছোট বাড়ী ছিল; তিনি উহা স্বামীজির এবং আমাদের মধ্যে যত জনের উহাতে স্থান হয়, তত জনের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যবস্থা স্বামীজির মনঃপূত হইল; তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধুর 'মেইন ক্যাম্প' (Maine Camp) নামক ভবন হইতে প্রত্যাগত হইযাই আমাদের নিকট তথায় আসিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

যে ছাত্রীটি বাড়ীখানির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মিস্ ডাচার। তিনি বুঝিলেন যে, এই উপলক্ষ্যে একটি পৃথক কক্ষ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক—যেখানে কেবল পবিত্র ভাবই বিরাজ করিবে, এবং তাঁহার গুরুর প্রতি প্রকৃত ভক্তি-অর্ঘ্য হিসাবে আসল বাড়ীখানি যত বড়, প্রায় তত বড়ই একটি নূতন পার্শ্ব নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বাড়ীটি এক উচ্চভূমির উপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটি অনেকখানি এবং উহার বহুদূরবিস্তৃত সহস্র দ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। দূরে ক্লেটন অল্প অল্প দেখা যাইত, আর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বিস্তৃত ক্যানাডা উপকূল উত্তরে দৃষ্টি অবরোধ করিত। বাড়ীখানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিম দিক হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া

আসিয়াছে, তাহার তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে; শেষোক্ত জলভাগটি একটি ক্ষুদ্র হ্রদের ন্যায় বাড়ীখানির পশ্চাতে রহিয়াছে। বাড়ীখানি সত্য সত্যই (বাইবেলের ভাষায়) 'একটি পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত,' আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উহার চারিদিকে পড়িয়াছিল। নবনির্ম্মিত পার্শ্বটি পাহাড়ের খুব ঢালু অংশে দণ্ডায়মান থাকায় যেন একটি বিরাট বাতি-ঘরের মত দেখাইত। বাড়ীটির তিন দিকে জানালা ছিল এবং উহা পিছনের দিকে ত্রিতল ও সামনের দিকে দ্বিতল ছিল। নীচের ঘরটিতে ছাত্রগণের মধ্যে একজন থাকিতেন; তাহার উপরকার ঘরটিতে বাড়ীখানির প্রধান অংশ হইতে অনেকগুলি দ্বার দিয়া যাওয়া যাইত, এবং প্রশস্ত ও সুবিধাজনক হওয়ায় উহাতেই আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত, এবং তথায়ই স্বামীজি অনেক ঘণ্টা ধরিয়া আমাদিগের সুপরিচিত বন্ধুর মত উপদেশ দিতেন। এই ঘরের উপরের ঘরটি শুধু স্বামীজিরই ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাহাতে উহা সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব হইতে পারে, তজ্জন্য মিস্ ডাচার বাহিরের দিকে একটি পৃথক্ সিঁড়ি করাইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য উহাতে দোতলার বারাণ্ডায় আসিবার একটি দরজাও ছিল।

এই উপরতলার বারাণ্ডাটি আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; কারণ, স্বামীজির সকল সান্ধ্য কথোপকথন এই স্থানেই হইত। বারাণ্ডাটি প্রশস্ত থাকায় উহাতে কতকটা স্থান ছিল। উহার উপরে ছাদ দেওয়া ছিল, এবং উহা বাড়ীখানির দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ছিল। মিস্ ডাচার উহার পশ্চিমাংশটি একটি পর্দ্দা দিয়া সযত্নে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং যে সকল অপরিচিত ব্যক্তি এই বারাণ্ডা হইতে তত্রত্য অপূর্ব্ব দৃশ্যটি দেখিবার

জন্য তথায় প্রায়ই আগমন করিতেন, তাঁহারা আমাদের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে পারিতেন না। এইখানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্য্যদেব তাঁহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন ছিল। পাদনিম্নে হরিৎপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশীর্ষগুলি হরিৎসমুদ্রের মত আন্দোলিত হইত; কারণ, সমগ্র স্থানটি ঘন অরণ্যে পরিবৃত ছিল। সুবৃহৎ গ্রামটির একখানি বাড়ীও তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে বাস করিতাম। বৃক্ষশ্রেণী হইতে দূরে বিস্তৃত সেণ্ট্ লরেন্স নদী; তদ্বক্ষে মাঝে মাঝে দ্বীপসমূহ; উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার হোটেল ও ভোজনালয়ের উজ্জ্বল আলোকে ঝিকমিক করিত। এই সকল এত দূরে বিদ্যমান ছিল যে, উহারা সত্য অপেক্ষা চিত্রিত দৃশ্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। আমাদের এই নির্জ্জন স্থানে জন-কোলাহলও কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। আমরা শুধু কীটপত-ঙ্গাদির অস্ফুট রব, পক্ষিগণের মধুর কাকলি, অথবা পত্রাভ্যন্তরচারী পবনের মৃদু মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে পাইতাম। দৃশ্যটির কিয়দংশ স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত থাকিত, এবং নিম্নের স্থির জলরাশিবক্ষে দর্পণের ন্যায় চন্দ্রের মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হইত। এই গন্ধর্ব্বরাজ্যে আমরা আচার্য্যদেবের সহিত সাতটি সপ্তাহ দিব্যানন্দে তাঁহার অতীন্দ্রিয়-রাজ্যের বার্ত্তাসমন্বিত অপূর্ব্ব বচনাবলী শ্রবণ করিতে করিতে অতি-বাহিত করিয়াছিলাম—তখন আমরাও জগৎকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম,

জগৎও আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে প্রতিদিন সান্ধ্য-ভোজন-সমাপনান্তে আমরা সকলে উপরকার বারাণ্ডাটিতে গমন করিয়া আচার্য্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতাম। অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত না; কারণ, আমরা সমবেত হইতে না হইতেই তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইত এবং তিনি ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া তাঁহার অভ্যস্ত আসন গ্রহণ করিতেন। তিনি আমাদিগের সহিত প্রত্যহ দুই ঘণ্টা এবং অনেক সময়েই তদধিক কাল যাপন করিতেন। এক অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্যময়ী রজনীতে (সে দিন নিশানাথ প্রায় পূর্ণাবয়ব ছিলেন) কথা কহিতে কহিতে চন্দ্রাস্ত হইয়া গেল; আমরাও যেমন কালক্ষেপের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই, স্বামীজিও যেন ঠিক তদ্রূপই জানিতে পারেন নাই।

এই সকল কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয় নাই; তাহারা শুধু শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়েই গ্রথিত হইয়া আছে। এই সকল দিব্য অবসরে আমরা যে উচ্চাঙ্গের গভীর ধর্ম্মানুভূতিসকল লাভ করিতাম, তাহা আমাদিগের কেহই ভুলিতে পারিবেন না। স্বামীজি ঐ সকল সময়ে তাঁহার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিতেন। ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য তাঁহাকে যে সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সেগুলি যেন পুনরায় আমাদের নেত্রগোচর হইত। তাঁহার গুরুদেবই যেন সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার মুখাবলম্বনে আমাদের নিকট কথা কহিতেন, আমাদের সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিতেন, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সমুদয় ভয় দূর করিতেন। অনেক সময়ে স্বামীজি যেন আমাদের উপস্থিতিই ভুলিয়া যাইতেন;—তখন আমরা পাছে তাঁহার চিন্তাপ্রবাহে বাধা দিয়া ফেলি—এই ভয়ে যেন শ্বাসরুদ্ধ করিয়া থাকিতাম। তিনি

আসন হইতে উঠিয়া বারাণ্ডাটির সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেন। এই সকল সময়ে তিনি যেরূপ কোমলপ্রকৃতি ছিলেন এবং সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন, তেমন আর কখনও দেখা যায় নাই; তাঁহার গুরুদেব যেরূপে তাঁহার শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন, ইহা হয়ত অনেকটা তদনুরূপই ব্যাপার—তিনি নিজেই নিজ আত্মার সহিত ভাবমুখে কথা কহিয়া যাইতেন, আর শিষ্যগণ শুধু শুনিয়া যাইতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় একজন লোকের সহিত বাস করাই অবিশ্রান্ত উচ্চ উচ্চ অনুভূতি লাভ করা। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সেই একই ভাব—আমরা এক ঘনীভূত ধর্ম্মভাবের রাজ্যে বাস করিতাম। স্বামীজি মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় ক্রীড়াশীল ও কৌতুক-প্রিয় হইলেও এবং সোল্লাসে পরিহাস করিতে ও কথার চোটপাট জবাব দিতে অভ্যস্ত থাকিলেও, কখন মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র হইতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না। প্রতি জিনিসটি হইতেই তিনি কিছু না কিছু বলিবার অথবা উদাহরণ দিবার বিষয় পাইতেন, এবং এক মুহূর্ত্তে তিনি আমাদিগকে কৌতুকজনক হিন্দু পৌরাণিক গল্প হইতে একেবারে গভীর দর্শনের মধ্যে লইয়া যাইতেন। স্বামীজি পৌরাণিক গল্পসমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন আর প্রকৃতপক্ষে এই প্রাচীন আর্য্যগণের মত আর কোন জাতির মধ্যেই এত অধিক পরিমাণে পৌরাণিক গল্পের প্রচলন নাই। তিনি আমাদিগকে ঐ সকল গল্প শুনাইয়া প্রীতি অনুভব করিতেন এবং আমরাও শুনিতে ভালবাসিতাম। কারণ, তিনি কখনও এই সকল গল্পের অন্তরালে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে এবং উহা হইতে মূল্যবান্ ধর্ম্মবিষয়ক

উপদেশ আবিষ্কার করিয়া দিতে বিস্মৃত হইতেন না। কোন ভাগ্যবান ছাত্রমণ্ডলী এরূপ প্রতিভাবান আচার্য্যলাভে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবার এমন সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

আশ্চর্য্য কাকতালীয় ন্যায়ে ঠিক দ্বাদশ জন ছাত্রী ও ছাত্র 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' স্বামীজির অনুগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদিগকে প্রকৃত শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই জন্যই তিনি আমাদিগকে এরূপ দিবারাত্র প্রাণ খুলিয়া, তাঁহার নিকট যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু ছিল তাহাই শিক্ষা দিতেন। এই বার জনের সকলেই এক সময়ে একত্র হন নাই, ঊর্দ্ধসংখ্যায় দশ জনের অধিক কোন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। আমাদের মধ্যে দুইজন পরে 'সহস্র দ্বীপোদ্যানেই' সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির সন্ন্যাসের সময় স্বামীজি আমাদিগের পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট কয়জন পরে নিউ-ইয়র্ক নগরে স্বামীজির তত্রত্য অপর কয়েকজন শিষ্যের সহিত একসঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' গমনকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, আমরা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া একযোগে বাস করিব; প্রত্যেকেই গৃহকর্ম্মের নিজ নিজ অংশ সম্পন্ন করিবেন, তাহাতে কোন বাজে লোকের সংস্পর্শে আমাদের গৃহের শান্তিভঙ্গ হইতে পারিবে না। স্বামীজি স্বয়ং একজন পাকা রাঁধুনী ছিলেন, এবং আমাদের জন্য প্রায়ই উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার গুরুদেবের দেহান্তের পরে যখন তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সেবা করিতেন, সেই সময়েই তিনি রন্ধনকার্য্য শিখিয়াছিলেন। এই যুবকগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া যাহাতে

তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারিত সত্যসমূহ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া দিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহার গুরুদেবকর্ত্তৃক আরব্ধ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমাদের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কার্যগুলি শেষ হইবামাত্র (অনেক সময়ে তাহার পূর্ব্বেই) স্বামীজি আমাদিগকে, যে বৃহৎ বৈঠকখানাটিতে আমাদের ক্লাসের অধিবেশন হইত তথায় সমবেত করিয়া শিক্ষাদান আরম্ভ করিতেন। প্রতিদিন তিনি কোন একটি বিশেষ বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উপনিষৎ বা ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্র প্রভৃতি কোন ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। বেদান্তসূত্রে বেদান্তান্তর্গত মহাসত্যগুলি যতদূর সম্ভব স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ আছে। তাহাদের কর্ত্তা ক্রিয়া কিছুই নাই এবং সূত্রকারগণ প্রত্যেক অনাবশ্যক পদ পরিহার করিতে এত আগ্রহান্বিত থাকিতেন যে, হিন্দুগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে,— সূত্রকার বরং তাঁহার একটি পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার সূত্রে একটি অতিরিক্ত অক্ষরও বসাইতে প্রস্তুত নহেন।

অত্যন্ত স্বল্পাক্ষর—প্রায় হেঁয়ালির মত বলিয়া বেদান্তসূত্রগুলিতে ভাষ্যকারগণের মাথা খাটাইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্ব, এই তিন জন হিন্দু মহাদার্শনিক উহাদের উপর বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন। প্রাতঃকালের কথোপকথনগুলিতে স্বামীজি প্রথমে এই ভাষ্যগুলির কোনও একটি লইয়া, তৎপরে আর একটি এইরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং দেখাইতেন, কিরূপে প্রত্যেক ভাষ্যকার তাঁহার নিজ মতানুযায়ী সূত্রগুলির কদর্থ করার অপরাধে অপরাধী এবং যাহা তাঁহার নিজ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করিবে, নিঃসঙ্কোচে

সেইরূপ অর্থই সেই সূত্রের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন! জোর করিয়া মূলের বিকৃতার্থ করারূপ কদভ্যাস কত পুরাতন, তাহা স্বামীজি আমাদিগকে প্রায়ই দেখাইয়া দিতেন।

কাজেই এই কথোপকথনগুলিতে কোন দিন বা মধ্ববর্ণিত শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ, আবার কোন দিন বা রামানুজ-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যাত হইত। কিন্তু শংকরের অদ্বৈতমূলক ব্যাখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাখ্যাত হইত। তবে শংকরের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চুলচেরা বিচার আছে বলিয়া উহা সহজবোধ্য ছিল না, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত রামানুজই ছাত্রগণের মনের মত ব্যাখ্যাকার রহিয়া যাইতেন।

কখনও কখনও স্বামীজি নারদীয় ভক্তিসূত্র লইয়া ব্যাখ্যা করিতেন। এই সূত্রগুলিতে ঈশ্বরভক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে, এবং উহা পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ ধারণা হয়—হিন্দুদের প্রকৃত, সর্ব্বগ্রাসী, আদর্শ ঈশ্বরপ্রেম কিরূপ—সে প্রেম সত্যসত্যই সাধকের মন হইতে অপর সমুদয় চিন্তা দূর করিয়া তাহাকে ভূতে পাওয়ার মত পাইয়া বসে! হিন্দুগণের মতে ভক্তি ঈশ্বরের সহিত তাদাত্ম্যভাব লাভ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়; এ উপায় ভক্তগণের স্বভাবতঃই ভাল লাগে। ঈশ্বরকে—কেবল তাঁহাকেই—ভালবাসার নামই ভক্তি।

এই কথোপকথনগুলিতেই স্বামীজি সর্ব্বপ্রথম আমাদিগের নিকট, তাঁহার মহান্ আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন—কিরূপে স্বামীজি দিনের পর দিন তাঁহার সহিত কাল কাটাইতেন এবং কিরূপে তাঁহাকে নিজ নাস্তিক মতের দিকে ঝোঁক দমন করিবার জন্য কঠোর চেষ্টা করিতে হইত এবং উহা যে সময়ে সময়ে তাঁহার গুরুদেবকে সন্তাপিত করিয়া তাঁহাকে কাঁদাইয়াও ফেলিত—এই সকল

কথা বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণ প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, স্বামীজি একজন মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহার কার্য্যে বিশেষভাবে সাহায্য করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন এবং তিনি কে, তাহা জানিবামাত্র শরীর ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিতেন যে, উক্ত সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে স্বামীজিকে শুধু ভারতেরই কল্যাণের জন্য নহে, কিন্তু অপর দেশসমূহের জন্যও কোনও একটি বিশেষ কার্য্য করিতে হইবে। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "বহুদূরে আমার আরও সব শিষ্য আছে; তাহারা এমন সব ভাষায় কথা কহে, যাহা আমি জানি না।"

'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' সাত সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামীজি নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পরে অন্যত্র ভ্রমণে বাহির হইলেন। নভেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতে এবং ছাত্রগণকে লইয়া ক্লাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথায় পুনরায় ক্লাস আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার ছাত্রগণ জনৈক উপযুক্ত সাঙ্কেতিক-লিখনবিৎকে (stenographer) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে স্বামীজির উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। এই ক্লাসের বক্তৃতাগুলি কিছুদিন পরেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি ও পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ তাঁহার সাধারণসমক্ষে বক্তৃতাগুলিই আজি স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় প্রচারকার্য্যের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলিতে স্বামীজিকে যেন আবার সজীব বোধ হয় এবং তিনি যেন তাঁহাদিগের সহিত কথা কহিতেছেন,

এইরূপ মনে হয়। তাঁহার বক্তৃতাগুলি যে এরূপ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তজ্জন্য কৃতিত্ব একজনের—যিনি পরে স্বামীজির একজন মহা অনুরাগী ভক্ত হইয়াছিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কার্য্য নিষ্কাম-প্রেম-প্রসূত ছিল, সুতরাং ঐ কার্য্যের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল।

এস, ই, ওয়াল্ডো

নিউ-ইয়র্ক ১৯০৮

আচার্য্যদেব

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমার স্মৃতিপটে অন্যান্য দিন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পবিত্র দিবস হইয়া রহিয়াছে; কারণ ঐ দিনেই আমি সর্ব্বপ্রথম সেই মহাপুরুষ, সেই ধর্ম্ম-জগতের মহাবীর স্বামী বিবেকানন্দের মূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহাব কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি, যিনি দুই বৎসর পরে আমায় শিষ্যপদে বরণ করিয়া অপার আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিলেন। তিনি এই দেশেব (আমেরিকাব) বড় বড নগরগুলিতে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং ডিট্রেয়েটেব ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চে তিনি যে সকল ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন, তাহার প্রথমটি উক্ত দিবসে প্রদত্ত হয়। জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, সুবৃহৎ প্রাসাদটিতে সত্যসত্যই তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না এবং স্বামীজি তথায় বাজসম্মানে সম্মানিত হন। যখন তিনি বক্তৃতামঞ্চে পদার্পণ করিলেন, তাঁহাব তখনকার সেই রাজশ্রীমণ্ডিত মহিমময় মূর্ত্তি যেন এখনও আমার নয়নগোচর হইতেছে। উহা যেন অসীম শক্তির আধার এবং মুহূর্ত্তেই সকলের উপর স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইতেছে! আর তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র—শব্দ নয়, যেন সঙ্গীত—এই বীণাব ন্যায় করুণ রাগিণীতে বাজিতেছে, এই আবার গম্ভীর, শব্দময়, আবেগময় হইয়া ঝঙ্কার দিতেছে—সমস্ত সভা নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল—সে নিস্তব্ধতা যেন স্পষ্ট অনুভূত হইতেছিল—এবং সেই বিপুল জনসংঘ শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় শ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

স্বামীজি তথায় সর্ব্বসমক্ষে পাঁচটি বক্তৃতা দেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন, কারণ তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপর অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তিনি এমন ভাবে কথা কহিতেন, যেন তিনি 'চাপরাস' পাইয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত যুক্তিগুলি কখনও ন্যায়বিরুদ্ধ হইত না, উহাতে তৎকথিত সিদ্ধান্তগুলির সত্যতার উপর দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া দিত, আর বক্তৃতার অতি উৎকৃষ্ট অংশেও তিনি কদাপি ভাববশে চালিত হইয়া, যে সত্যটি তিনি লোকের মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিতে প্রয়াস করিতেছিলেন, সেই মূল বক্তব্যটি হারাইয়া ফেলিতেন না।

তিনি নির্ভীকভাবে তাঁহার অননুমোদিত ধর্ম্ম বা দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবাদ করিতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে লোকে স্বতঃই বুঝিতে পারিত যে, এ ব্যক্তির হৃদয় এত মহৎ যে উহা লোকের দোষ ও দুর্ব্বলতার দিকে না দেখিয়া সমুদয় বিশ্বকে আপনার বুকে টানিয়া লইতে পারে; ইনি লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে ও তাহাদিগকে ক্ষমা কবিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইবেন না। বাস্তবিকই, পরে আমার তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতালাভের সুযোগ ঘটিলে আমি দেখিয়াছি, তিনি সত্যসত্যই মানুষের যতদূর সাধ্য ততদূর ক্ষমা করেন। আহা, কি অপরিসীম ভালবাসা ও ধৈর্য্যের সহিত তিনি তাঁহার সমীপাগত লোকদিগকে তাহাদের নিজ নিজ দুর্ব্বলতার গোলকধাঁধা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া, তাহাদিগকে 'কাঁচা আমি'র গণ্ডি অতিক্রম করাইয়া ঈশ্বরলাভের মার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন! তিনি ঈর্ষা বলিয়া কিছু জানিতেন না। যদি কেহ তাঁহাকে গালি দিত, তিনি গম্ভীর হইয়া যাইতেন, "শিব শিব" বলিতে বলিতে তাঁহার বদন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, আর তিনি বলিতেন, "ইহা ত শুধু প্রিয়তম প্রভুরই বাণী!" অথবা আমাদের

মধ্যে যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, তাহারা যদি এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইত, তাহাদিগকে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "যে নিন্দাস্তুতির কর্ত্তা ও পাত্র উভয়কেই এক বলিয়া জানে, তাহার নিকট ইহাতে কি আসিয়া যায়?" আবার ঐ সকল স্থলে তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপে তাঁহাকে কেহ গালি দিলে বা কটু কথা বলিলে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না, তৎসম্বন্ধে কোন এক গল্প বলিতেন। তিনি বুঝাইতেন, ভাল মন্দ সকল বস্তুই, সকল দ্বন্দ্বই "আদরিণী শ্যামা মায়ের" নিকট হইতে আসিয়া থাকে।

কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল এবং একটি দিনের জন্যও আমি তাঁহার চরিত্রে এতটুকু দাগ দেখিতে পাই নাই। মানবের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতাগুলি তাঁহাতে স্থান পাইত না; আর যদি বিবেকানন্দের কোন দোষ থাকিত, তবে উহা নিশ্চয়ই উদার ভাবের দোষ হইত। এত বড় হইয়াও তিনি বালকের মত সরল ছিলেন; ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত যেমন, দরিদ্র ও পতিত লোকদিগের সহিতও তিনি ঠিক তেমনই ভাবে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন।

ডিট্রয়েটে অবস্থানকালে মিশিগ্যানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার বিধবা পত্নী মিসেস্ জন্ জে, ব্যাগ্‌লির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা রমণী অতি বিরল, ইঁহার ধর্ম্মভাবও অসাধারণ ছিল। ইনি আমাকে বলিয়াছেন যে, স্বামীজি যতদিন (প্রায় একমাস কাল) তাঁহার গৃহে অতিথি ছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে একক্ষণের জন্যও অতি উচ্চদরের ভাব ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ পাইত না, এবং তাঁহার অবস্থানে গৃহ যেন অবিরত মঙ্গলপ্রবাহে পূর্ণ থাকিত।

মিসেস্ ব্যাগ্‌লির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অনারেবল্ টমাস ডবলিউ, পামারের অতিথিরূপে একপক্ষ কাল বাস করেন। মিঃ পামার জাগতিক মহামেলা বৈঠকের (World's Fair Commission) অধ্যক্ষ ছিলেন; ইনি পূর্ব্বে স্পেনদেশে যুক্তরাজ্যের রাজদূতস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং যুক্তরাজ্যের মহাসভার একজন সভ্যও (Senator) ছিলেন। এই ভদ্রলোক এখনও জীবিত আছেন এবং ইঁহার বয়স অশীতি বর্ষেরও অধিক হইয়াছে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই বলিতে পারি যে, আমি যে কয়েক বৎসর ধরিয়া স্বামীজির সহিত পরিচিত ছিলাম, তন্মধ্যে আমি তাঁহাকে কদাপি আদর্শে ও কার্য্যে উচ্চতম ভাব ব্যতীত অন্য কিছু প্রকাশ করিতে দেখি নাই।

আহা! স্বামীজি কত লোকের ভালবাসাই না আকর্ষণ করিয়াছেন! মানুষ যে তাঁহার মত এত অমলধবল, এত নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে, তাহা আমি ধারণায়ও আনিতে পারিতাম না! উহাই তাঁহাকে অন্য সকল মানব হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ রূপলাবণ্যসম্পন্না রমণীগণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শুধু সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিত না। তবে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমি তোমাদের তীক্ষ্ণধী বিদুষীগণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে চাই, আমার পক্ষে উহা একটি অভিনব ব্যাপার; কারণ আমার দেশে নারীগণ অধিকাংশ স্থলেই অন্তঃপুরচারিণী!"

তাঁহার চালচলন বালকসুলভ সরলতাময় ছিল এবং লোককে অতিশয় মুগ্ধ করিত। আমার মনে আছে, একদিন তিনি অদ্বৈতানুভূতির পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করিয়া একটি অতি চিত্তগ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছেন;

পরক্ষণেই দেখিলাম, তিনি সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি একটা কিছুর কিনারা করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়াছেন। লোকে উপর নীচে যাতায়াত করিতেছে—কেহ গাত্রবস্ত্র আনিবার জন্য, কেহ অন্য কিছুর জন্য। সহসা তাঁহার আনন উৎফুল্ল হইয়া লঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বুঝিয়াছি! উপরে উঠিবার সময় পুরুষেরা স্ত্রীলোকের আগে যায়; আর নীচে নামিবার সময় স্ত্রীলোক পুরুষের আগে আসে, নয় কি?" তাঁহার প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষার ফলস্বরূপ, তিনি আচার-মর্য্যাদা-লংঘনকে আতিথ্যেরই নিয়মভঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

যাঁহারা তাঁহার জীবনের সংকল্পিত কার্য্যগুলিতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগের কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে বলিলেন যে, তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব হওয়া একান্ত আবশ্যক। একজন শিষ্যা সম্বন্ধে তিনি অনেক আশা পোষণ করিতেন। তাঁহার মধ্যে ভাবী ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিশিষ্ট পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকিবেন। একদিন তিনি আমাকে একাকী পাইয়া, তিনি কিরূপ জীবন যাপন করেন ও কিরূপ লোকের সঙ্গে মিশেন ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন, এবং আমি সে সকলগুলিরই উত্তর দিবার পর তিনি আমার দিকে অতি আগ্রহান্বিতভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তিনি খুব শুদ্ধসত্ত্ব, না?" আমি শুধু বলিলাম, "হাঁ স্বামীজি, সম্পূর্ণ শুদ্ধসত্ত্ব।" তাঁহার মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষু হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল, তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "আমি ইহা জানিতাম, আমি ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার কলিকাতার কার্য্যের জন্য আমি তাঁহাকে চাই।" তৎপরে তিনি ভারতীয় নারীকুলের উন্নতি-

কল্পে তাঁহার সংকল্পিত কার্য্যপ্রণালীর কথা এবং ঐ বিষয়ে তিনি যে সকল আশা পোষণ করেন তাহার কথা কহিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন, "তাহাদের চাই শিক্ষা; আমাদিগকে কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।" তথায় পরে একটি বালিকা-বিদ্যালয় সিষ্টার নিবেদিতা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, আর উক্ত শিষ্যাটিও তাঁহার সহিত উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় একটি গলিতে বাস করেন, সাড়ী পরেন এবং যথাসাধ্য বালিকাগণকে মাতার ন্যায় সেবাযত্ন করেন। স্বামীজির সহিত আমার প্রথম পরিচয়কালে তিনি আমার সঙ্গিনী ছিলেন, কারণ আমরা উভয়ে একত্রে আচার্য্য-দেবকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি। সেই শীতকালটিতে তিনি ডিট্রয়েটের সকল লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিতমহলে তাঁহার প্রভূত প্রতি-পত্তি হইয়াছিল এবং লোকে তাঁহার সহিত কথা কহিবার জন্য সুযোগ খুঁজিত। দৈনিক সংবাদপত্রগুলি তাঁহার গতিবিধির সংবাদ রাখিতে লাগিল। একখানি কাগজে গম্ভীরভাবে উল্লিখিত হইল যে, খুব মরিচের গুঁড়া দেওয়া রুটি মাখনই তাঁহার প্রাতরাশ। রাশি রাশি চিঠি ও নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল, এবং ডিট্রয়েট বিবেকানন্দের পদানত হইল।

ডিট্রয়েট তাঁহার বরাবর প্রিয় ছিল এবং তাঁহার প্রতি এই সমস্ত সদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সদাই কৃতজ্ঞ ছিলেন। আমাদের সে সময়ে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার কোন সুযোগ ছিল না, কিন্তু আমরা তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতে এবং যাহা শুনিতাম মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প ছিল যে, কোন সময়ে, কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবই করিব, যদি

আমাদিগকে তজ্জন্য সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। প্রায় দুই বৎসর আমরা তাঁহার কোনও খোঁজ পাইলাম না এবং মনে করিলাম, হয় ত তিনি ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একদিন অপরাহ্ণে একজন বন্ধু আমাদিগকে সংবাদ দিলেন যে, তিনি এখনও এই দেশেই আছেন এবং গ্রীষ্মকালটি 'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' যাপন করিতেছেন। তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিব, এই দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া আমরা পরদিন প্রাতে যাত্রা করিলাম।

অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর আমারা তাঁহাব সাক্ষাৎ পাইলাম। তিনি জনকোলাহল হইতে দূরে আসিয়া বাস করিতেছেন, এমত অবস্থায় তাঁহার শান্তিভঙ্গ করিবার দুঃসাহস করিয়াছি, এই ভাবিয়া আমবা যারপর নাই ভীত হইলাম; কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে এমন এক আগুন জ্বালিয়াছেন, যাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই অদ্ভুত ব্যক্তি ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে আমাদিগকে আরও জানিতে হইবেই। সে দিন অন্ধকারময়ী রজনী, ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আবার আমবাও দীর্ঘ পথভ্রমণে শ্রান্ত, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের মনে শান্তি নাই। তিনি কি আমাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন? আর যদি না করেন, তবে আমাদের উপায়? আমাদের হঠাৎ মনে হইল যে, এক ব্যক্তি, যিনি আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহুশত ক্রোশ চলিয়া আসা হয়ত বা মূর্খতার কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু সেই অন্ধকার ও বৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা কষ্টেসৃষ্টে পাহাড়টি চড়াই করিতে লাগিলাম; সঙ্গে একজন লণ্ঠনধারী লোক, তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়া দিবার জন্য ভাড়া করিয়াছিলাম। পরে

এই ঘটনা-প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব আমাদিগকে এইরূপে অভিহিত করিতেন, "আমার শিষ্যদ্বয়, যাঁহারা শত শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আসিয়াছিলেন।" তাঁহাকে কি বলিব, পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যেমন আমরা বুঝিলাম যে, সত্যসত্যই আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, অমনি আমরা সেই সব ছন্দোবদ্ধ বক্তৃতা ভুলিয়া গেলাম, আর আমাদের মধ্যে একজন কোনমতে অস্ফুটস্বরে বলিতে পারিল, "আমরা ডিট্রয়েট হইতে আসিতেছি এবং মিসেস্ প— আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।" আর একজন বলিলেন, "ভগবান ঈশা এখনও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিলে যেরূপ আমরা তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উপদেশ ভিক্ষা করিতাম, আমরা আপনার নিকট সেইরূপই আসিয়াছি।" তিনি আমাদের দিকে অতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "শুধু যদি আমার ভগবান খ্রীষ্টের ন্যায় তোমাদিগকে এই মুহূর্ত্তে মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিত!" ক্ষণেকের জন্য তিনি চিন্তামগ্নভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং পরে গৃহস্বামিনীকে (তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন) বলিলেন, "এই মহিলাদ্বয় ডিট্রয়েট হইতে আসিতেছেন ইঁহাদিগকে উপরে লইয়া যান, ইঁহারা এই সন্ধ্যাটি আমাদের সহিত অতিবাহিত করিবেন।" আমরা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের কথা শুনিতে লাগিলাম। তিনি আমাদের প্রতি আর কোন মনোযোগ দিলেন না, কিন্তু আমরা সকলের নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি আমাদিগকে পরদিন নয়টার সময় আসিতে বলিলেন। আমরা কালবিলম্ব না করিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং আচার্য্যদেবও আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া তথায় স্থায়িভাবে

বাস করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন আমাদের কি আনন্দ!

আমাদের তথায় অবস্থানসম্বন্ধে আর একজন শিষ্যা বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন। আমি শুধু এইটুকু বলিব যে, সে গ্রীষ্মঋতুটি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেই কাটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি যেমন ছিলেন, এমনটি তাঁহাকে আর কখন দেখি নাই। এখানে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত বলিয়া তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যও অতি সুন্দরভাবেই বিকাশ পাইয়াছিল।

আমরা তথায় বার জন ছিলাম এবং বোধ হইতেছিল যেন জ্বালাময়ী ঐশী শক্তি (Pentecostal fire) অবতরণ করিয়া পুরাকালে খ্রীষ্টশিষ্যগণের ন্যায় আচার্য্যদেবকেও স্পর্শ করিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে ত্যাগমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে গৈরিকবসনধারী যতিগণের আনন্দ ও স্বাধীনতার বর্ণনা করিতে করিতে সহসা তিনি উঠিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণেই ত্যাগবৈরাগ্যের চরম-সীমাস্বরূপ 'Song of the Sannyasin' (সন্ন্যাসীর গীতি) শীর্ষক কবিতাটি লিখিয়া ফেলিলেন। আমার মনে হয়, তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য্য ও কোমলতাই আমাকে ঐ কালে সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছিল। পিতা তাঁহার সন্তানদের যে চক্ষে দেখেন, তিনিও আমাদের সেই চক্ষে দেখিতেন —যদিও আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। প্রাতঃকালের ক্লাসের কথোপকথনগুলি শুনিয়া সময়ে সময়ে আমাদের মনে হইত, যেন তিনি ব্রহ্মকে করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমন সময়ে হয়ত তিনি সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, "এখন আমি তোমাদের জন্য রন্ধন করিতে যাইতেছি।" আর কত ধৈর্য্যের সহিত তিনি উনানের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য কোন কিছু ভারতীয় আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন!

ডিট্রয়েটে আমাদের সহিত শেষবার অবস্থানকালে তিনি একদিন আমাদিগের জন্য অতি উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রতিভাশালী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ শিষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবগুলি নিজহস্তে পূরণ করিয়া দিতেছেন—শিষ্যগণের পক্ষে কি অপূর্ব্ব উদাহরণ! তিনি ঐ সকল সময়ে কত কোমল, কত করুণস্বভাব হইতেন! কত কোমলতাময় পুণ্যস্মৃতিই না তিনি আমাদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন!

একদিন স্বামীজি আমাদিগকে একটি গল্প বলিলেন—এই গল্পটিই তাঁহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শৈশবে ধাত্রীর মুখে তিনি উহা বারবার শুনিয়াছিলেন এবং বার বার শুনিয়াও তাঁহার কখনও বিরক্তিবোধ হইত না। যতদূর সম্ভব তাঁহার নিজের ভাষাতে উহা আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি ঃ

এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি সন্তান ছিল। ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দরিদ্রা ছিলেন, আর পুত্রটি অতি অল্পবয়স্ক ছিল—শিশু বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণের সন্তান, সুতরাং তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইতেই হইবে। কিন্তু কিরূপে উহা সম্ভব হয়? দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর যে গ্রামে বাস তথায় কোন শিক্ষক ছিল না, সুতরাং বালককে শিক্ষালাভ করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইতে হইত, এবং তাহার জননী অত্যন্ত দরিদ্রা থাকায় তাহাকে তথায় হাঁটিয়া যাইতে হইত। গ্রামদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল এবং বালককে উহা অতিক্রম করিতে হইত। সকল উষ্ণপ্রধান দেশের ন্যায় ভারতেও খুব প্রাতে এবং পুনরায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, দিবসের গ্রীষ্মাধিক্যে কোন কাজ হয় না। সুতরাং বালকের পাঠশালায় যাইবার সময় এবং পুনরায় বাড়ী ফিরিবার সময় রোজই অল্প অন্ধকার থাকিত। আমাদের

দেশে যাহাদের সঙ্গতি নাই, তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, সুতরাং বালক বিনাব্যয়ে এই গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে পাইল, কিন্তু তাহাকে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হইত এবং সঙ্গে কেহ না থাকায় সে মহা ভয় পাইত। একদিন বালক তাহার মাতার নিকট বলিল, "আমাকে প্রত্যহ ঐ ভয়ঙ্কর বনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, আমার ভয় পায়। অন্য ছেলেদের সঙ্গে চাকর যায়, তাহারা তাহাদের দেখে শোনে, আমার সঙ্গে যাইবার জন্য কেন একটি চাকর থাকিবে না?" উত্তরে মাতা বলিলেন, "বাবা, দুঃখের কথা কি বলিব, আমি যে বড় গরীব, আমার যে তোমার সঙ্গে চাকর দিবার সঙ্গতি নাই।" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা হইলে আমি কি করিব?" মাতা বলিলেন, "বলিতেছি। এক কাজ কর—ঐ বনে তোমার রাখাল-দাদা কৃষ্ণ আছেন (ভারতে শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম 'রাখাল-রাজ'), তাঁহাকে ডাকিও, তাহা হইলে তিনি আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং তুমিও আর একা থাকিবে না।" বালক পরদিনও সেই বনে প্রবেশ করিল এবং ডাকিতে লাগিল, "রাখাল-দাদা, রাখাল-দাদা, তুমি এখানে আছ কি?" এবং শুনিতে পাইল, কে যেন বলিতেছে, "হাঁ, আছি।" বালক সান্ত্বনা পাইল এবং আর কখনও ভয় করিত না। ক্রমে সে দেখিতে লাগিল, তাহারই বয়সী এক বালক বন হইতে বাহির হইয়া তাহার সহিত খেলা করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। ছেলেটির মনে আর দুঃখ রহিল না। কিছুদিন পরে গুরুমহাশয়ের পিতৃবিয়োগ হইল, এবং ভারতের প্রথামত তদুপলক্ষে একটি বৃহৎ অনুষ্ঠান হইল। সেই সময়ে সকল ছাত্রকেই গুরুমহাশয়কে কিছু কিছু উপহার দিতে হয়, সুতরাং দরিদ্র বালক তাহার মাতার নিকট গিয়া বলিল, "মা, অন্য ছেলেদের মত আমিও গুরুমহাশয়কে কিছু উপহার দিব, আমাকে কিছু কিনিয়া দাও।" কিন্তু

জননী বলিলেন যে, তিনি নিতান্ত দরিদ্রা। তাহাতে বালক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার উপায়?" শেষে মাতা বলিলেন, "রাখাল-দাদার কাছে গিয়া তাঁহার নিকট চাও।" ইহা শুনিয়া বালক বনের মধ্যে গিয়া ডাকিল, "রাখাল দাদা, গুরুমহাশয়কে উপহার দিবার জন্য তুমি আমাকে কিছু দিবে কি?" অমনি তাহার সম্মুখে একটি দুগ্ধভাণ্ড উপস্থিত হইল। বালক কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভাণ্ডটি গ্রহণ করিল এবং গুরুমহাশয়ের গৃহে গিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া, ভৃত্যগণ তাহার উপহারটি গুরুমহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবে, এইজন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অন্য উপঢৌকনগুলি এত জাঁকজমকপূর্ণ ও চমৎকার ছিল যে, চাকরেরা তাহার দিকে খেয়ালই দিল না। তাহাতে সে মুখ ফুটিয়া কহিল, "গুরুমহাশয়, এই আমি আপনার জন্য উপহার আনিয়াছি।" গুরুমহাশয় মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, উপহার অতি সামান্য, নগণ্য সামগ্রী, এবং অবজ্ঞাভরে ভৃত্যকে বলিলেন, "এ যখন ইহা লইয়া এত চেঁচামেচি করিতেছে, তখন দুধটা একটা পাত্রে ঢালিয়া লইয়া উহাকে বিদায় কর।" ভৃত্য ভাণ্ডটি লইয়া দুধটুকু একটি বাটিতে ঢালিল, কিন্তু সে ভাণ্ডটি নিঃশেষ করিতে না করিতে উহা আবার পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে উহাকে শূন্য করিতে পারিল না! তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ব্যাপার? এ ভাণ্ড তুমি কোথায় পাইলে?" ছেলেটি উত্তর দিল, "রাখাল-দাদা আমাকে বনে উহা দিয়াছেন।" তাহারা সকলে বলিয়া উঠিল, "বল কি! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ, আর তিনি উহা তোমাকে দিয়াছেন?" বালক বলিল, "হাঁ এবং তিনি আমার সহিত প্রত্যহ খেলা করেন এবং আমি পাঠশালায় আসিবার সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসেন।" সকলে বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল কি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াও, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেল?" আর গুরুমহাশয়ও বলিলেন, "তুমি

৩

আমাদিগকে লইয়া গিয়া উহা দেখাইতে পার?" ছেলেটি বলিল, "হাঁ, পারি। আমার সঙ্গে আসুন।" তখন ছেলেটি এবং গুরুমহাশয় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বালক নিত্যকার অভ্যাসমত ডাকিতে লাগিল, "রাখাল-দাদা, এই আমার গুরুমহাশয় আসিয়াছেন, কোথায় তুমি?" কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। বালক বারংবার ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর আসিল না। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "রাখাল-দাদা, একবার এস, নতুবা সকলে আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে।" তখন শুনা গেল বহু দূর হইতে কে যেন বলিতেছে, "আমি তোমার নিকট আসি কারণ তুমি শুদ্ধসত্ত্ব এবং তোমার সময় হইয়াছে, কিন্তু তোমার গুরুমহাশয়কে এখনও আমার দর্শনলাভের জন্য বহু জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে।"

'সহস্র দ্বীপোদ্যানে' গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং পরবর্ত্তী বসন্তকালের (১৮৯৬ খৃঃ) পূর্ব্বে আমি আর তাঁহাকে দেখি নাই। উক্ত সময়ে তিনি দুই সপ্তাহের জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার সাঙ্কেতিক-লেখক (Stenographer) বিশ্বস্ত গুড্উইন্। তাঁহারা রিশিলুতে (The Richelieu) কয়েকখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন। রিশিলু একটি ক্ষুদ্র 'ফ্যামিলি হোটেল'—তথায় একাধিক লোক সপরিবারে বাস করিত। তত্রত্য বৃহৎ বৈঠকখানাটি তিনি ক্লাসের অধিবেশন ও বক্তৃতার জন্য ব্যবহার করিতে পাইতেন। কিন্তু উহা এত বড় ছিল না যে, উহাতে সেই বিপুল জনসংঘের সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় এবং দুঃখের বিষয়, অনেককে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত। বৈঠকখানা, দরদালান, সিঁড়ি এবং পুস্তকাগারে সত্য-সত্যই এক তিল স্থান থাকিত না। সেই কালে তিনি একেবারে ভক্তিমাখা ছিলেন—ভগবৎপ্রেমই তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণাস্বরূপ ছিল। তিনি যেন

একপ্রকার ঐশ্বরিক উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রেমময়ী জগজ্জননীর সান্নিধ্যলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছিল।

ডিট্রয়েটে সাধারণের সমক্ষে তাঁহার শেষ উপস্থিতি বেথেল মন্দিরে। স্বামীজি জনৈক অনুরাগী ভক্ত রাবি লুই গ্রোস্‌ম্যান তথায় যাজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে দিন রবিবার সন্ধ্যাকাল এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, আমাদের ভয় হইয়াছিল বুঝি লোকে বিহ্বল হইয়া একটা কি করিয়া বসে। রাস্তার উপরেও অনেক দুর পর্য্যন্ত ঠাসা লোক, এবং শত শত ব্যক্তিকে ফিরিতে হইয়াছিল। স্বামীজি সেই বৃহৎ শ্রোতৃসংঘকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল—'পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রতি ভারতের বাণী' ও 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের আদর্শ'। তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল। সে রজনীতে আচার্য্যদেবকে যেমনটি দেখিয়াছি, তেমনটি আর কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল, যাহা এ পৃথিবীর নহে। মনে হইতেছিল, যেন আত্মাপক্ষী দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাঁহার আসন্ন দেহাবসানের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহু বর্ষের অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিনি যে অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিবেন না, তাহা তখনই বুঝিতে পারা গিয়াছিল। আমি "না, না, এ কিছু নহে" বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা অনুভব করিলাম। তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ভিতর হইতে বুঝিতেছিলেন, তাঁহাকে কার্য্য করিয়াই যাইতে হইবে।

ইহার পর আমি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার দর্শন পাই। তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যের

উন্নতি হইবে, এই বিবেচনায় তিনি গোলকোণ্ডা জাহাজে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তিনি দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন যে, জাহাজখানি 'টিলবেরি ডকে' পৌছিবার সময় তাঁহার দুই জন আমেরিকা-বাসী শিষ্য তথায় উপস্থিত আছেন। তিনি অমুক দিন যাত্রা করিবেন, একখানি ভারতীয় মাসিক পত্রে এই সংবাদটি পাইবামাত্র আমরা কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলাম, কারণ তাঁহার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাইয়াছিলাম, তাহাতে আমরা অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম।

তিনি অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে যেমন বালকের ন্যায় হইয়াছিল, তাঁহার ক্রিয়াকলাপও তদ্রূপ হইয়াছিল। এই সমুদ্রযাত্রার ফলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব বল ও শক্তি কথঞ্চিৎ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবার স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। লণ্ডনের অনতিদূরে উইম্বলডন্ নামক স্থানের একটি প্রশস্ত পুরাতন ধরনের বাটীতে স্বামি-দ্বয়ের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্থানটি বেশ কোলাহলশূন্য ও শান্তিপ্রদ ছিল এবং আমরা তথায় একমাসকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

স্বামিজী সে বার সাধারণের সমক্ষে কোন বক্তৃতাদি করেন নাই এবং শীঘ্রই স্বামী তুরীয়ানন্দ ও তাঁহার আমেরিকাবাসী বন্ধুগণ-সমভি-ব্যাহারে আমেরিকা যাত্রা করেন। সমুদ্রবক্ষে দশটী চিরস্মরণীয় দিবস অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, সংস্কৃত কবিতা ও গল্পের আবৃত্তি ও অনুবাদ এবং সুর করিয়া প্রাচীন বৈদিক স্তোত্রপাঠ হইত। সমুদ্রে বীচিবিক্ষোভ ছিল না এবং রজনীতে

চন্দ্রালোক অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিত। ঐ কয়দিনের সন্ধ্যাগুলি অতি চমৎকার ছিল; আচার্য্যদেব ডেকের উপর পায়চারী করিতেন, চন্দ্রালোকে তাঁহার বপুঃ অতি মহদ্ভাবব্যঞ্জক দেখাইত, মধ্যে মধ্যে পাদচারণ হইতে বিরত হইয়া তিনি আমাদিগের নিকট প্রকৃতির শোভাসম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতেন এবং বলিয়া উঠিতেন, "দেখ, এই সব মায়ারাজ্যের বস্তুই যদি এত সুন্দর হয়, তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহাদের পশ্চাতে যে নিত্যবস্তু রহিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য কত অপরূপ!"

এক বিশেষ রমণীয় রজনীতে যখন পূর্ণচন্দ্রের কনককিরণধারায় জগৎ হাসিতেছিল, সেই অপরূপ মোহকরী রজনীতে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাকভাবে দৃশ্যমাধুরী পান করিতেছিলেন। সহসা আমাদিগের দিকে চাহিয়া সমুদ্র ও আকাশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "যখন কবিত্বের চরম সীমা ঐ সম্মুখে রহিয়াছে, তখন আবার কবিতা-আবৃত্তির প্রয়োজন কি?"

আমরা যথাসময়ে নিউইয়র্ক পৌঁছিলাম; গুরুদেবের সহিত এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল আমরা আরও বিলম্বে পৌঁছিলাম না কেন? ইহার পর তাঁহার সাক্ষাৎ পাই ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে—এই সময় তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত কিছুদিন যাপন করিবার জন্য ডিট্রয়েটে আগমন করিয়াছিলেন।

তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন—যেন ভাবময় তনু, যেন সেই মহান্ আত্মা আর হাড়মাসের খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবে না! আর একবার আমরা সত্যকে দেখিয়াও দেখিলাম না—কোন আশা নাই জানিয়াও তাঁহার আরোগ্যের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।

আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু "সেই অপর শিষ্যটি" স্বামিজী আমাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, কয়েক সপ্তাহ ভারতে তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কথা মনে করিলেই যারপরনাই কষ্ট বোধ হয়। সে হৃদয়ভেদী দুঃখ এখনও আমার সঙ্গী হইয়া রহিয়াছে কিন্তু এই সকল দুঃখকষ্টের অন্তরালে অতি গভীরপ্রদেশে এক মহতী শান্তি বিরাজমান—তথায় এই মধুর দিব্য অনুভূতি বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, মহাপুরুষগণ স্বীয় জীবনদ্বারা লোককে সত্যের পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আর, এইরূপ একজন মহাপুরুষের সঙ্গ ও কৃপালাভ যে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইয়াছিল—যখন আমি এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করি এবং দিনের পর দিন তাঁহার উক্তিগুলির মধ্যে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য ও গভীরতর অর্থ দেখিতে পাই, এবং তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকি, তখন আমার সত্যসত্যই ধারণা হয়, কে যেন বলিতেছে, "জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, উহা পবিত্রভূমি।"

ডিট্রয়েট, মিশিগ্যান, ১৯০৮

এম, সি, ফাঙ্কি

দেববাণী

১৮৯৫ খ্রীঃ, ১৯শে জুন, বুধবার

[স্বামীজি একখানি বাইবেল হস্তে লইয়া ছাত্রগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং উহার নবসংহিতাভাগের (New Testament) মধ্যে উপস্থিত জনের গ্রন্থখানি (Gospel according to St. John) খুলিয়া বলিলেন, তোমরা যখন সকলেই খ্রীষ্টিয়ান, তখন খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করাই ভাল।]

জনের গ্রন্থ প্রারম্ভেই এই কথাগুলি আছে—

"আদিতে শব্দমাত্র ছিল, সেই শব্দ ব্রহ্মের সহিত বিদ্যমান ছিল, আর সেই শব্দই ব্রহ্ম।"

হিন্দুরা এই 'শব্দ'কে মায়া বা ব্রহ্মের ব্যক্তভাব বলে থাকেন, কারণ এটা ব্রহ্মেরই শক্তি। যখন সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাকে আমরা মায়াবরণের মধ্য দিয়ে দেখি, তখন তাকে আমরা 'প্রকৃতি' বলে থাকি। 'শব্দে'র দুটো বিকাশ, একটা এই 'প্রকৃতি'—এইটেই সাধারণ বিকাশ। আর এর বিশেষ বিকাশ হচ্ছে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণ। সেই নির্গুণ ব্রহ্মের বিশেষ বিকাশ যে খ্রীষ্ট, তাঁকে আমরা জেনে থাকি, তিনি আমাদের জ্ঞেয়। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুকে আমরা জানতে পারি না। আমরা পরম পিতাকে[১] জানতে পারি না, কিন্তু তাঁর তনয়কে[২] জানতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্মকে

---

১ God the Father

২ God the Son

আমরা শুধু মানবস্বরূপ রঙ্গের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে দেখতে পারি।

জন-লিখিত গ্রন্থের প্রথম পাঁচ শ্লোকেই খ্রীষ্টধর্মের সারতত্ত্ব নিহিত। এর প্রত্যেক শ্লোকটি গভীরতম দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ।

পূর্ণস্বরূপ যিনি, তিনি কখন অপূর্ণ হন না। তিনি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছেন বটে, কিন্তু ঐ অন্ধকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ঈশ্বরের দয়া সকলেরই উপর রয়েছে, কিন্তু তাদের পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আমরা নেত্ররোগাক্রান্ত হয়ে সূর্য্যকে অন্যরূপ দেখতে পারি, কিন্তু তাতে যেমন সূর্য্য তেমনই থাকে, তার কিছু এসে যায় না। জনের উনত্রিংশ শ্লোকে যে লেখা আছে, "জগতের পাপ দূর করেন"—তার মানে এই যে, খ্রীষ্ট আমাদিগকে পূর্ণতালাভ করবার পথ দেখিয়ে দেবেন। ঈশ্বর খ্রীষ্ট হয়ে জন্মালেন—মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য, আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ এইটে জানিয়ে দেবার জন্য। আমরা হচ্চি সেই দেবত্বের উপর মনুষ্যত্বের আবরণ দেওয়া, কিন্তু দেবভাবাপন্ন মানুষহিসাবে খ্রীষ্ট ও আমাদের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নেই।

ত্রিত্ববাদীদের [১] (Trinitarian) যে খ্রীষ্ট তিনি আমাদের মত সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত। একত্ববাদীদের (Unitarian) খ্রীষ্ট ঈশ্বর নন, শুধু একজন সাধুপুরুষ। এ দুইয়ের কেউই আমাদের সাহায্য করতে পারেন না। কিন্তু যে খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার, তিনি নিজ ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হন নি, সেই খ্রীষ্টই আমাদের সাহায্য করতে পারেন,

১ ত্রিত্ববাদী Trinitarian—ইঁহাদের মতে ঈশ্বর পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মাভেদে একেই তিন। অপর সম্প্রদায় ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন—খ্রীষ্ট মনুষ্যমাত্র।

তাঁতে কোনরূপ অপূর্ণতা নেই। এই সকল অবতারদের রাতদিন মনে থাকে যে তাঁরা ঈশ্বর—তাঁরা আজন্ম এটা জানেন। তাঁরা যেন সেই সব অভিনেতাদের মত, যাঁদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—নিজেদের আর কোন প্রয়োজন নেই, তবু যাঁরা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জন্যই রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন। এই মহাপুরুষগণকে সংসারের কোন মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুকাল আমাদের মত মানুষ হয়ে আসেন, আমাদেরই মত বদ্ধ বলে ভান করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কখনই বদ্ধ নন, সদাই মুক্তস্বভাব।

* * *

মঙ্গল জিনিষটা সত্যের সমীপবর্ত্তী বটে, কিন্তু তবু ওটা সত্য নয়। অমঙ্গল যাতে আমাদের বিচলিত করতে না পারে, এইটে শেখবার পর আমাদের শিখতে হবে, যাতে মঙ্গল আমাদের সুখী করতে না পারে। আমাদের জানতে হবে যে, আমরা মঙ্গল-অমঙ্গল দুইয়েরই বাইরে। ওদের উভয়েরই যে স্থাননির্দ্দেশ আছে, সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে; আর বুঝতে হবে যে, একটা থাকলেই অপরটা থাকবেই থাকবে। দ্বৈতবাদের ভাবটা প্রাচীন পারসীকদের[১] কাছ থেকে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ভাল-মন্দ দুই-ই এক জিনিষ এবং উভয়ই আমাদের মনে। মন যখন স্থির ও শান্ত হয়, তখন ভাল-মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শুভাশুভ দুইয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মুক্ত হও, তখন এদের কেউ আর তোমায় স্পর্শ করতে

---

১ জরথুষ্ট্রের অনুগামী প্রাচীন পারস্যবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন, অহুরমজদ্ ও অহ্রিমান নামক শুভাশুভের অধিষ্ঠাতা দেবদ্বয় দ্বারা সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রিত।

পারবে না, তুমি মুক্ত হয়ে পরমানন্দ সম্ভোগ করবে। অশুভ যেন লোহার শিকল, আর শুভ সোনার শিকল; কিন্তু দুই-ই শিকল। মুক্ত হও এবং জন্মের মত জেনে রাখ, কোন শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে না। সোনার শিকলটির সাহায্যে লোহার শিকলটি আল্গা করে নাও, তার পর দুটোকে ফেলে দাও। অশুভরূপ কাঁটা আমাদের শরীরে রয়েছে; ঐ ঝাড়েরই আর একটি কাঁটা (শুভরূপ) নিয়ে পূর্ব্বের কাঁটাটি তুলে ফেলে শেষে দুটোকেই ফেলে দাও, দিয়ে মুক্ত হও।

* * *

জগতে সর্ব্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো। সর্ব্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেয়ো না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, এতটুকুও যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও; কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। কোন সর্ত্ত ফর্ত্ত করো না, তা হলেই তোমার ঘাড়েও কোন সর্ত্ত ফর্ত্ত চাপবে না। আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই দিয়ে যাই—ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন।

ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা, জগতের সকলেই ত দোকানদার মাত্র। ··· তাঁর সই-করা হুণ্ডি (চেক) যোগাড় করলেই যেখানে যাবে তার খাতির হবে।

ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তিনি উপলব্ধির বস্তু; কিন্তু তাঁকে কখনও 'ইতি' 'ইতি' করে নির্দ্দেশ করা যায় না।

* * *

আমরা যখন দুঃখকষ্ট এবং সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি তখন জগৎটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন আমরা দুটো কুকুর-বাচ্ছাকে পরস্পর খেলা করতে বা কামড়াকামড়ি করতে

দেখে সে দিকে আদৌ খেয়াল দিই না, জানি যে দুটোতে মজা কচ্ছে, এমন কি, মাঝে মাঝে জোরে এক আধটা কামড় লাগ্‌লেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু, সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জগৎটা সবই কেবল খেলার জন্য—ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপাদন করতে পাবে না।

* * *

'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়াঝড় মোহতুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।
একে মনমাঝি আনাড়ি, রিপু ছজন কুজন দাঁড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি ;
ভেঙ্গে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল, উপায় কি করি।
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গানামের ভেলা ধরি।'

মাতঃ, তোমার প্রকাশ যে শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে নেই, তা নয় ; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। আলোক অশুচি বস্তুর উপর পড়্‌লেও অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়্‌লেও তার গুণ বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনেই সেই সৌম্যাৎ সৌম্যতরা, নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

তিনি দুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার সুখের ভিতর, উদাত্ত ভাবের ভিতরও রয়েছেন। ঐ যে ভ্রমর মধুপান করছে ও সেই প্রভুই ভ্রমররূপে মধুপান কচ্ছেন। ঈশ্বরই রয়েছেন জেনে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিন্দাস্তুতি দুই-ই ছেড়ে দেন। জেনে রাখ যে, কিছুতেই তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। কি করে করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি কি আত্মা নও? তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্রস্বরূপ।[1]

আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারাওয়ালা আমাদের ধর্‌বার জন্য পিছু পিছু ছুটছে—তাই আমরা জগতের যা সৌন্দর্য্য, তার শুধু ঈষৎ আভাসমাত্রই দেখে থাকি। এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। জড়ের যা কিছু সত্তা সে ত কেবল ওর পেছনে মন রয়েছে বলে। আমরা জগৎ বলে যা দেখ্‌ছি, তা ঈশ্বরই—প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন।

২৩শে জুন, রবিবার

সাহসী ও অকপট হও—তার পর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভক্তিবিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ কর্‌বে। একবার শিকলের একটা কড়া কোনমতে যদি ধরে ফেল, সমগ্র শিকলটাকে ক্রমে ক্রমে টেনে আনতে পারবে! গাছের শিকড়ে যদি জল দাও সমস্ত গাছটাই তাতে জল পাবে। ভগবানকে যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে সমুদয়ই পাওয়া গেল।

---

১ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং……স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ। কেনোপনিষৎ, ২য় শ্লোক

একঘেয়ে ভাবই জগতে মহা অনিষ্টকর জিনিষ। তোমরা নিজেদের ভিতর যত ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ করতে পারবে, ততই জগৎকে বিভিন্নভাবে—কখনও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, কখনও বা ভক্তের দৃষ্টিতে সম্ভোগ করতে পারবে। নিজের প্রকৃতিটাকে আগে ঠিক কর, তার পর সেই প্রকৃতি-অনুযায়ী পথ অবলম্বন করে তাতে লেগে পড়ে থাক। প্রবর্ত্তকের পক্ষে নিষ্ঠাই (একটা ভাবে দৃঢ় হওয়া) একমাত্র উপায়; কিন্তু যদি যথার্থ ভক্তিবিশ্বাস থাকে এবং যদি 'ভাবের ঘরে চুরি' না থাকে, তবে ঐ নিষ্ঠাই তোমায় এক ভাব থেকে সব ভাবে নিয়ে যাবে। গির্জ্জা, মন্দির, মত-মতান্তর, নানাবিধ অনুষ্ঠান, এগুলি যেন চারাগাছকে রক্ষা করবার জন্য তার চারিদিকে বেড়া দেওয়া। কিন্তু যদি গাছটাকে বাড়াতে চাও, তা হলে শেষে সেগুলিকে ভেঙ্গে দিতে হবে। এইরূপ বিভিন্ন ধর্ম্ম, বেদ, বাইবেল, মতমতান্তর—এ সবও যেন চারাগাছের টবের মত, কিন্তু টব থেকে ওকে একদিন না একদিন বেরুতে হবে। নিষ্ঠা যেন চারাগাছটিকে টবে বসিয়ে রাখা—সাধককে তার নির্ব্বাচিত পথে আগলে রাখা।

* * *

সমগ্র সমুদ্রটার দিকে দেখ, এক একটা তরঙ্গের দিকে দেখো না; একটা পিঁপড়ে ও একজন দেবতার ভিতর কোন প্রভেদ দেখো না। প্রত্যেক কীটটি পর্য্যন্ত প্রভু ঈশার ভাই। একটাকে বড়, অপরটাকে ছোট বল কি করে? নিজের নিজের কোটে সকলেই যে স্ব স্ব প্রধান। আমরা যেমন এখানে রয়েছি, তেমনি সূর্য্য, চন্দ্র, তারাতেও রয়েছি। আত্মা দেশকালের অতীত ও সর্ব্বব্যাপী। যে-কোন মুখে সেই প্রভুর গুণগান উচ্চারিত হচ্ছে, তাই আমার মুখ, যে-কোন চক্ষু কোন বস্তু দেখছে তাই আমার চক্ষু। আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ নই; আমরা দেহ নই,

সমগ্র বহ্মাণ্ডই আমাদের দেহ। আমরা যেন ঐন্দ্রজালিকের মত মায়াযষ্টি ঘোরাচ্ছি, আর ইচ্ছামত আমাদের সম্মুখে নানা দৃশ্য সৃষ্টি করছি। আমরা যেন মাকড়সার মত আমাদেরই নির্ম্মিত বৃহৎ জালের মধ্যে অবস্থান করছি—মাকড়সা যখনই ইচ্ছা করে, তখনই তার জালের সুতোগুলোর যে-কোনটাতে যেতে পারে। বর্ত্তমানে সে যেখানটায় রয়েছে, সেইখানটাই কেবল জানতে পারছে, কিন্তু কালে সমস্ত জালটাকে জানতে পারবে। আমরাও এখনও আমাদের দেহটা যেখানে রয়েছে, সেখানটাতেই নিজ সত্তা অনুভব করছি, এখন আমরা কেবল একটা মস্তিষ্কমাত্র ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু যখন পূর্ণজ্ঞান বা জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হই, তখন আমরা সব জান্‌তে পারি, সব মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারি। এখনই আমরা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানকে ধাক্কা দিয়ে এমন ঠেলে দিতে পারি যে, সে তার সীমা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে জ্ঞানাতীত বা পূর্ণজ্ঞানভূমিতে কাজ করতে থাকবে।

আমরা চেষ্টা করছি, কেবল অস্তিস্বরূপ, সৎস্বরূপ হতে—তাতে 'আমি' পর্য্যন্ত থাকবে না—কেবল শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশ হবে; তাতে সমগ্র জগতের প্রতিবিম্ব পড়্‌বে, কিন্তু তা যেমন তেমনই থাকবে। এই অবস্থা লাভ হলে আর ক্রিয়া কিছু থাকে না, শরীরটা কেবল যন্ত্রবৎ হয়ে যায়; সে সদা শুদ্ধভাবাপন্নই থাকে, তার শুদ্ধির জন্য আর চেষ্টা করতে হয় না; সে অপবিত্র হতেই পারে না।

নিজেকে সেই অনন্তস্বরূপ বলে জান, তা হলে ভয় একদম চলে যাবে। সর্ব্বদাই বল, "আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) এক।"[১]

* * *

আঙ্গুরগাছে যেমন থোলো থোলো আঙ্গুর ফলে, ভবিষ্যতে তেমনই

[১] I and my Father are one.—বাইবেল

খোলো খোলো খ্রীষ্টের অভ্যুদয় হবে। তখন সংসারখেলা শেষ হয়ে যাবে। সকলেই সংসারচক্র থেকে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে যাবে। যেমন, একটা কেট্‌লিতে জল চড়ান হয়েছে; জল ফুটতে আরম্ভ হতেই প্রথমে একটার পর একটা করে বুদ্‌বুদ উঠতে থাকে, ক্রমে এই বুদ্বুদগুলোর সংখ্যা বেশী হতে থাকে, শেষে সমস্ত জলটা টগবগ করে ফুটতে থাকে ও বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায়। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুটি বুদ্‌বুদ। মুশা ছিলেন একটি ছোট বুদ্‌বুদ, তার পর তারে বাড়া, তারে বাড়া আরও সব বুদ্‌বুদ উঠেছে। কোন সময়ে কিন্তু জগৎশুদ্ধ এইরূপ বুদ্‌বুদ হয়ে বাষ্পাকারে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সৃষ্টি ত অবিশ্রাম প্রবাহে চল্‌ছেই, আবার নূতন জলের সৃষ্টি হয়ে ঐ পূর্ব্ব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকবে।

২৪শে জুন, সোমবার (অদ্য স্বামীজি 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' হইতে স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন):

"ভক্তি ঈশ্বরে পরমপ্রেমস্বরূপ এবং অমৃতস্বরূপ—যা লাভ করে মানুষ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্বলাভ করে ও তৃপ্ত হয়—যা পেলে আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোন কিছুর জন্য শোক করে না, কারও প্রতি দ্বেষ করে না, অপর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভব করে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করে না—যা জেনে মানব মত্ত হয়, স্তব্ধ হয় ও আত্মারাম হয়।"[১]

১ ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা

ওঁ অমৃতস্বরূপা চ।

ওঁ যৎ লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি অমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি।

ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।

ওঁ যজ্‌জ্ঞানাৎ মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি।

—নারদভক্তিসূত্র, ১ম অনুবাক, ২য় হইতে ৬ষ্ঠ সূত্র

গুরুমহারাজ বলতেন, "এই জগৎটা একটা মস্ত পাগলা-গারদ। এখানে সবাই পাগল, কেউ টাকার জন্য পাগল, কেউ মেয়েমানুষের জন্য পাগল, কেউ নামযশের জন্য পাগল, আর জনকতক ঈশ্বরের জন্য পাগল। অন্যান্য জিনিষের জন্য পাগল না হয়ে ঈশ্বরের জন্য পাগল হওয়াই ভাল নয় কি? ঈশ্বর হচ্ছেন পরশমণি। তাঁর স্পর্শে মানুষ এক মুহূর্ত্তে সোনা হয়ে যায়; আকারটা যেমন তেমনি থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতি বদলে যায়—মানুষের আকার থাকে, কিন্তু তার দ্বারা কারও অনিষ্ট করা যেতে পারে না, কিম্বা কোন অন্যায় কর্ম্ম হতে পারে না।"

"ঈশ্বরের চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ গায়, কেউ নাচে, কেউ কেউ অদ্ভুত বিষয় সব বলে। কিন্তু সকলেই সেই এক ঈশ্বরেরই কথা কয়।"[১]

মহাপুরুষেরা ধর্ম্মপ্রচার করে যান, কিন্তু যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারেরা ধর্ম্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে একেই পবিত্রাত্মার (Holy Ghost) শক্তি বলেছে—এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই 'হস্ত-স্পর্শে'র (The laying-on of hands) কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য্য (খ্রীষ্ট) প্রকৃতপক্ষেই শিষ্যগণের ভিতর শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। একেই 'গুরু-পরম্পরাগত শক্তি' বলে। এই যথার্থ ব্যাপটিজম্ই (Baptism—দীক্ষা) অনাদিকাল থেকে জগতে চলে আসছে।

---

১ ভাগবতে নিম্নলিখিত শ্লোকে এই ভাবের কথা আছে—

কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৩২শ শ্লোক

"ভক্তিকে কোন বাসনাপূরণের সহায়স্বরূপে গ্রহণ করতে পারা যায় না, কারণ ভক্তিই সমুদয় বাসনা-নিরোধের কারণস্বরূপ।"* নারদ ভক্তির নিম্নলিখিত লক্ষণ দিয়েছেন, "যখন সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য ও সমুদয় ক্রিয়া তাঁর প্রতি অর্পিত হয় এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁকে বিস্মৃত হলে হৃদয়ে পরম ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হয়েছে বুঝতে হবে।"†

"পূর্ব্বোক্ত ভক্তিই প্রেমের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। কারণ অন্যান্য সাধারণ প্রেমে প্রেমিক প্রেমাস্পদের নিকট তার প্রেমের প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু ভক্ত এই প্রেমে কেবল তাঁর সুখে সুখী হয়ে থাকে।"‡

"প্রকৃত ভক্তিলাভ হলে যে সমুদয় ত্যাগ হয় বলা হয়েছে তার তাৎপর্য্য এই যে, সেই ব্যক্তির সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম ত্যাগ হয়ে যায়।"

"যখন অন্য সব আশ্রয় ত্যাগ করে চিত্ত তাঁর প্রতি আসক্ত হয় এবং তাঁর বিরোধী সমুদয় বিষয়ে উদাসীন হয়, তখনই যথার্থ ভক্তিলাভ হয়েছে, বুঝতে হবে।"×

---

* ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ।
—নারদভক্তিসূত্র, ২য় অনুবাক, ৭ম সূত্র

† ওঁ নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।
—ঐ, ৩য় অনুবাক, ১৯শ সূত্র

‡ ওঁ নাস্ত্যেব তস্মিন্ তৎসুখসুখিত্বম্।—ঐ, ৩য় অনুবাক, ২৪শ সূত্র

× ওঁ নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ।
ওঁ তস্মিন্ অনন্যতা তদ্বিরোধিষু উদাসীনতা।
—নারদভক্তিসূত্র, ২য় অনুবাক, ৮ম ও ৯ম সূত্র

"যতদিন না ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ, ততদিন শাস্ত্রবিধি মেনে চল্‌তে হবে।"*

যতদিন না তোমার চিত্তের এতদূর দৃঢ়তা হচ্ছে যে, শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন না করলেও তোমার হৃদয়ের যথার্থ ভক্তিভাব নষ্ট হয় না, ততদিন ঐ গুলি মেনে চল, কিন্তু তার পর তোমায় শাস্ত্রের পারে যেতে হবে। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে চলাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। আধ্যাত্মিক সত্যের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষীকরণ। প্রত্যেককে নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সেটা সত্য কি না। যদি কোন ধর্ম্মাচার্য্য বলেন, আমি এই সত্য দর্শন করেছি, কিন্তু তোমরা কোনকালে পারবে না, তাঁর কথায় বিশ্বাস করো না; কিন্তু যিনি বলেন, তোমরাও চেষ্টা করলে দর্শন করতে পার্‌বে, কেবল তাঁর কথায় বিশ্বাস কর্‌বে। জগতের সকল যুগের সকল দেশের সকল শাস্ত্র, সকল সত্যই বেদ। কারণ, এই সকল সত্য প্রত্যক্ষ করতে হয়, আর সকলেই ঐ সকল সত্য আবিষ্কার করতে পারে।

যখন ভক্তিসূর্য্যের কিরণে দিগন্ত প্রথম উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তখন আমরা সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করতে চাই এবং এক মুহূর্ত্ত তাঁকে বিস্মৃত হলে অতিশয় ক্লেশ অনুভব করি।

ঈশ্বর এবং তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি—এ দুয়ের মাঝখানে যেন আর এমন কিছু না আসে, যাতে তোমায় তাঁর দিকে অগ্রসর হতে বাধা দিতে পারে। তাঁকে ভক্তি কর, তাঁর প্রতি অনুরাগী হও, তাঁকে ভালবাস, জগতের লোক যে যা বলে বলুক, গ্রাহ্য করো না। প্রেমভক্তি তিন প্রকার—সমর্থা, সমঞ্জসা, সাধারণী। সাধারণীতে প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রেমাস্পদের

* ওঁ ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্‌।

—নারদভক্তিসূত্র, ২য় অনুবাক, ১২শ সূত্র

নিকট কেবল এই দাও, ঐ দাও বলে চেয়ে থাকে, কিন্তু নিজে কিছু দেয় না; সমঞ্জসায় বিনিময়ের ভাব থাকে ; সমর্থায় কিন্তু কিছু প্রতিদান চায় চায় না, যেমন পতঙ্গের আলোর প্রতি ভালবাসা—পুড়ে মরবে তবু ভালবাসতে ছাড়বে না।

"এই ভক্তি—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হতেও শ্রেষ্ঠ।"*

কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তার নিজেরই চিত্তশুদ্ধি হয়, তার দ্বারা অপরের কোন উপকার হয় না। আমাদের নিজের সাধন করে নিজের উন্নতিসাধন করতে হবে, মহাপুরুষেরা কেবল আমাদের পথ দেখিয়ে দেন মাত্র। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" যীশুর উপর যদি তুমি তোমার ভার দাও, তা হলে তোমায় সদা সর্ব্বদা তাঁকে চিন্তা করতে হবে, এই চিন্তার ফলে তুমি তদ্ভাবাপন্ন হবে। এইরূপ সদা সর্ব্বদা ভাবনার নামই ভক্তি বা প্রেম। "পরা ভক্তি ও পরা বিদ্যা এক জিনিস।"

তবে ঈশ্বরসম্বন্ধে কেবল নানা মতমতান্তরের আলোচনা করলে চলবে না। তাঁকে ভালবাসতে হবে ও সাধন করতে হবে। সংসার ও সাংসারিক বিষয় সব ত্যাগ কর, বিশেষতঃ যতদিন 'চারাগাছটা'—মন শক্ত না হয়। দিবারাত্রি ঈশ্বরচিন্তা কর এবং যতদূর সম্ভব অন্য বিষয়ের চিন্তা ছেড়ে দাও। দৈনন্দিন যে-সকল কর্ত্তব্য ও চিন্তা না করলে নয়, সে-গুলি সবই তদ্ভাবভাবিত হয়ে করা যেতে পারে।

'শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মাবে।'

---

* ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।
—নারদভক্তিসূত্র, ৪র্থ অনুবাক, ২৫শ সূত্র

সকল কার্য্যে, সকল বস্তুতে তাঁকে দর্শন কর। অপরের সঙ্গে ঈশ্বর-কথার আলাপ কর। এতে আমাদের সাধনপথে খুব সাহায্য হয়ে থাকে।

ভগবানের অথবা তাঁর যোগ্যতম সন্তান যে-সব মহাপুরুষ তাঁদের কৃপালাভ কর।* এই দুটীই হচ্ছে ভগবানলাভের প্রধান উপায়।

এই সকল মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হওয়া বড়ই কঠিন, পাঁচ মিনিট কাল তাঁদের সঙ্গলাভ করলে একটা সারা জীবন বদলে যায়।† আর যদি সত্যসত্য প্রাণে প্রাণে এই মহাপুরুষসঙ্গ চাও, তবে তোমার কোন-না-কোন মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হবেই হবে।

এই ভক্তেরা যেখানে থাকেন সেই স্থান তীর্থস্বরূপ হয়ে যায়, তাঁরা যা বলেন তাই শাস্ত্রস্বরূপ, তাঁরা যে কোন কার্য্য করেন তাই সৎকর্ম্ম, এমনি তাঁদের মাহাত্ম্য।‡ তাঁরা যে স্থানে বাস করেছেন, সেই স্থান তাঁদের দেহনিঃসৃত পবিত্র শক্তিস্পন্দনে পূর্ণ হয়ে যায়; যারা সেথায় যায়, তারাই এই স্পন্দন অনুভব করে; তাইতে তাদেরও ভিতরে পবিত্রভাবের সঞ্চার হতে থাকে।

"এইরূপ ভক্তগণের ভিতর জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন প্রভৃতির ভেদ নাই। যে হেতু তারা তাঁর।"×

* ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।

—নারদভক্তিসূত্র, ৫ম অনুবাক, ৩৮ সূত্র

† মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।

—ঐ, ৫ম অনুবাক, ৩৯ সূত্র

‡ ওঁ তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি, সুকর্ম্মী কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি, সচ্ছাস্ত্রী কুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি।

ওঁ তন্ময়াঃ।—নারদভক্তি-সূত্র, ৯ম অনুবাক, ৬৯ ও ৭০ সূত্র

× ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।

ওঁ যতস্তদীয়াঃ। —ঐ, ৯ম অনুবাক, ৭২ ও ৭৩ সূত্র।

অসৎসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দাও, বিশেষতঃ প্রথমাবস্থায়। বিষয়ী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ কর, তাতে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়ে থাকে। 'আমি' 'আমার' এই ভাব সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর। যাঁর জগতে 'আমার' বলতে কিছুই নেই, তাঁরই কাছে ভগবান আবির্ভূত হন। সব রকম মায়িক প্রীতির বন্ধন কেটে ফেল। আলস্য ত্যাগ কর, আর 'আমার কি হবে' এরূপ ভাবনা একেবারে ভেবো না। তুমি যে-সব কাজ করেছ, তার ফলাফল দেখবার জন্য ফিরেও চেয়ো না। ভগবানে সমর্পণ করে কর্ম্ম করে যাও, কিন্তু ফলাফলেব চিন্তা একেবাবে করো না। * যখন সব মনঃপ্রাণ এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভগবানের দিকে যায়, যখন টাকাকড়ি বা নামযশ খুঁজে বেড়াবার সময় থাকে না, ভগবান ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করবার অবসর থাকে না, তখনই হৃদয়ে সেই অপার অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের উদয় হবে। বাসনাগুলো ত শুধু কাঠের মালার মত অসার জিনিস।

প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী, "এতে কোন কামনা নেই, এটি নিত্য

---

* ওঁ দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ।

ওঁ কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশ (সর্ব্বনাশ) কারণত্বাৎ।

ওঁ তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি।

ওঁ কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্ ? যঃ সঙ্গং ত্যজতি,

যো মহানুভাবং সেবতে, নির্ম্মমো ভবতি।

ওঁ যো বিবিক্তস্থানং সেবতে, যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি,

নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি।

ওঁ যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতি, কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যতি, ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি।

ওঁ বেদানপি সন্ন্যস্যতি ; কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে।

—নারদভক্তিসূত্র, ৬ষ্ঠ অনুবাক, ৪৩ হইতে ৪৯ সূত্র

নূতন ও প্রতিক্ষণে বাড়তে থাকে", এটি সূক্ষ্ম অনুভবস্বরূপ। অনুভবের দ্বারাই একে বুঝতে হয়, ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না। *

"ভক্তিই সব চেয়ে সহজ সাধন। ভক্তি স্বাভাবিক, এতে কোন যুক্তি-তর্কের অপেক্ষা নেই; ভক্তি স্বয়ংপ্রমাণ, এতে আর অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই।" † যুক্তি-তর্ক কাকে বলে?—কোন বিষয়কে আমাদের মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা; আমরা যেন (মনরূপ) জাল ফেলে কোন বস্তুকে ধরে বলি, এই বিষয়টা প্রমাণ করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল দিয়ে ধরতে পারব না—কোন কালেও নয়।

ভক্তি অহৈতুকী হওয়া চাই। এমন কি, আমরা যখন প্রেমের অযোগ্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসি, তখনও সেই প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত আনন্দের খেলা। প্রেমকে যেরূপেই ব্যবহার করি না কেন, "প্রেম কিন্তু স্বভাবতঃই শান্তি ও আনন্দ-স্বরূপ।‡"

হত্যাকারী যখন নিজ শিশুকে চুম্বন করে, তখন সে ভালবাসা ছাড়া আর সব ভুলে যায়। অহংটাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কাম ক্রোধ ত্যাগ কর—ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—পুরাতন মানুষটা একেবারে চলে গেছে, কেবল একমাত্র তুমিই আছ।

---

* ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্।

—ঐ, ৭ম অনুবাক, ৫৪ সূত্র

† ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ।

ওঁ প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ।

—ঐ, ৮ম অনুবাক, ৫৮ ও ৫৯ সূত্র

‡ ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।

—নারদভক্তিসূত্র, ৮ম অনুবাক, ৬০ সূত্র

'আমি—তুমি'। কাউকে নিন্দে করো না। যদি দুঃখ বিপদ আসে, জেনো ঈশ্বর তোমার সঙ্গে খেলা করছেন—আর এইটি জেনে দুঃখের ভিতরও পরম সুখী হও।

ভক্তি বা প্রেম দেশকালের অতীত, উহা পূর্ণস্বরূপ।

২৫শে জুন, মঙ্গলবার

যখনই কোন সুখভোগ করবে, তার পরে দুঃখ আসবেই আসবে—এই দুঃখ তখন তখনই আসতে পারে, অথবা খুব বিলম্বেও আসতে পারে। যে আত্মা যত উন্নত, তার সুখের পর দুঃখ তত শীঘ্র আসবে। আমরা চাই—সুখ-দুঃখ উভয়ের অতীত অবস্থায় যেতে। এ উভয়ই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। উভয়ই শিকল—একটা লোহার শিকল, অপরটা সোনার শিকল। এ উভয়ের পশ্চাতেই আত্মা রয়েছেন—তাঁতে সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ-দুঃখ উভয়ই অবস্থাবিশেষ, আর অবস্থামাত্রেই সদা পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আত্মা আনন্দস্বরূপ, অপরিণামী, শান্তিস্বরূপ। আমাদের আত্মাকে যে লাভ করতে হবে, তা নয়; আমরা আত্মাকে পেয়েই আছি, কেবল তাঁর উপর যে ময়লা পড়েছে, সেইটে ধুয়ে ফেলে তাঁকে দর্শন কর।

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই আমরা জগৎকে ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারব। খুব উচ্চভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত কর; আমি যে সেই অনন্ত আত্মস্বরূপ—এই জেনে আমাদের জগৎ-প্রপঞ্চের দিকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এই জগৎটা একটি ছোট শিশুর খেলার মত; আমরা যখন তা জানি, তখন জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই আমাদের চঞ্চল করতে পারবে না। যদি প্রশংসা পেলে মন উৎফুল্ল হয়, তবে নিন্দায়

নিশ্চিত বিষণ্ণ হবে। ইন্দ্রিয়ের, এমন কি, মনেরও সমুদয় সুখ অনিত্য; কিন্তু আমাদের ভিতরেই সেই নিরপেক্ষ সুখ রয়েছে, যে সুখ কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। ঐ সুখ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত সুখ, ঐ সুখ আনন্দস্বরূপ। সুখের জন্য বাইরের বস্তুর উপর নির্ভর না করে যত ভিতরের উপর নির্ভর করব—যতই আমরা 'অন্তঃসুখ, অন্তরারাম ও অন্তর্জ্জ্যোতিঃ' হব, আমরা ততই ধার্ম্মিক হব। এই আত্মানন্দকেই জগতে ধর্ম্ম বলে থাকে।

অন্তর্জ্জগৎ, যা বাস্তবিক সত্য, তা বহির্জ্জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণো বড়। বহির্জ্জগৎটা সেই সত্য অন্তর্জ্জগতের ছায়াময় বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এই জগৎটা সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়; এটা সত্যের ছায়াস্বরূপমাত্র। কবি বলেছেন, কল্পনা—"সত্যের সোনালী ছায়া।"

আমাদের বাদ দিলে জগৎটা অচেতন মৃত জড়পদার্থ মাত্র। আমরা যখন জগতের মধ্যে প্রবেশ করি, তখনই তা আমাদের পক্ষে সজীব হয়ে ওঠে। আমরাই জগতের পদার্থসমূহকে জীবন দান করছি, কিন্তু আবার আহাম্মকের মত ঐ কথা ভুলে গিয়ে কখনও তা থেকে ভয় পাচ্ছি, কখনও আবার তাই ভোগ করতে যাচ্ছি। আঁসচুব্‌ড়ি কাছে না থাকলে ঘুম হবে না—যেমন সেই মেছুনীদের হয়েছিল—এমন যেন তোমাদের না হয়। কতকগুলো মেছুনী আঁসচুব্‌ড়ি মাথায় করে বাজার থেকে বাড়ী ফিরছিল—এমন সময় খুব ঝড়বৃষ্টি এল। তারা বাড়ী যেতে না পেরে পথে তাদের এক আলাপী মালিনীর বাগান-বাড়ীতে আশ্রয় নিলে। মালিনী রাত্রে তাদের যে ঘরে শুতে দিলে, তার ঠিক পাশেই ফুলের বাগান। হাওয়াতে বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুলের গন্ধ তাদের নাকে আসতে লাগল—সেই গন্ধ তাদের এত অসহ্য বোধ হতে লাগল যে, তারা কোনমতে ঘুমুতে পারে না।

শেষে তাদের মধ্যে একজন বললে, 'দেখ, আমাদের আঁসচুব্ড়িগুলোতে জল ছড়িয়ে দিয়ে মাথার কাছে রেখে দেওয়া যাক।' তাই করাতে যখন নাকের কাছে সেই আঁসচুব্ড়ির গন্ধ আসতে লাগল তখন তারা আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল।

এই সংসারটা আঁসচুব্ড়ির মত—আমরা যেন সুখভোগের জন্য ওর উপর নির্ভর না করি। যারা করে, তারা তামসপ্রকৃতি বা বদ্ধজীব। তারপর আবার রাজসপ্রকৃতির লোক আছে; তাদের অহংটা খুব প্রবল, তারা সদাই 'আমি আমি' বলে থাকে। তারা কখন কখন সৎকার্য্য করে থাকে, চেষ্টা করলে তারা ধার্ম্মিক হতে পারে। কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তারা সদাই অন্তর্মুখ—তারা সদাই আত্মনিষ্ঠ। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ আছে; এক এক সময় মানুষে এক এক গুণের প্রাধান্য হয় মাত্র।

সৃষ্টি মানে একটা কিছু নির্ম্মাণ বা তৈরী করা নহে, সৃষ্টি মানে —যে সাম্যভাব নষ্ট হয়ে গেছে, সেইটাকে পুনর্লাভ করবার চেষ্টা —যেমন একটা শোলার ছিপি (কর্ক) যদি টুক্‌রো টুক্‌রো করে জলের নীচে ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেগুলো যেমন আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে কতকগুলো মিলে জলের উপরে ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, সেই রকম। যেখানে জীবন, যেখানে জগৎ, সেখানে কিছু না কিছু মন্দ, কিছু না কিছু অশুভ থাকবেই থাককে। একটুখানি অশুভ থেকেই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। জগতে যে কিছু কিছু মন্দ রয়েছে, এ খুব ভাল; কারণ সাম্যভাব এলে এই জগৎই নষ্ট হয়ে যাবে। সাম্য ও বিনাশ যে এক কথা। যতদিন এই জগৎ চলছে, ততদিন সঙ্গে সঙ্গে ভালমন্দও চলবে; কিন্তু যখন আমরা জগৎকে অতিক্রম

করি, তখন ভালমন্দ দুয়েরই পারে চলে যাই—পরমানন্দ লাভ করি।

জগতে দুঃখবিরহিত সুখ, অশুভবিরহিত শুভ কখন পাবার সম্ভাবনা নেই; কারণ, জীবনের অর্থ ই হচ্ছে সাম্যভাবেব বিচ্যুতি। আমাদের চাই মুক্তি; জীবন, সুখ বা শুভ—এ সবের কোনটাই নয়। সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলেছে—তার আদিও নেই, অন্তও নেই—যেন একটা অগাধ হ্রদের উপরকার সদা-গতিশীল তরঙ্গ। ঐ হ্রদের এমন সব গভীর স্থান আছে, যেখানে আমরা এখনও পৌঁছুতে পারি নি এবং আর কতকগুলি জায়গা আছে, যেখানে সাম্যভাব পুনঃ সংস্থাপিত হয়েছে—কিন্তু উপরের তরঙ্গ সর্ব্বদাই চলেছে, তথায় অনন্তকাল ধরে ঐ সাম্যাবস্থা-লাভের চেষ্টা চলেছে। জীবন ও মৃত্যু একটা ব্যাপারেরই বিভিন্ন নামমাত্র, একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। উভয়ই মায়া—এ অবস্থাটাকে পরিষ্কার ক'রে বোঝাবার জো নেই—এক সময়ে বাঁচবার চেষ্টা হচ্ছে, আবার পরমুহূর্ত্তে বিনাশ বা মৃত্যুর চেষ্টা। আমাদের যথার্থ স্বরূপ—আত্মা—এই উভয়েরই পারে। আমরা যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তা আর কিছু নয়, তা প্রকৃতপক্ষে সেই আত্মাই—যা থেকে আমরা আমাদের পৃথক্ করে ফেলেছি, আর আমাদের থেকে পৃথক্ বলে উপাসনা করছি। কিন্তু তা চিরকালই একমাত্র ঈশ্বরপদবাচ্য, যে আমাদের অন্তরাত্মা, তাঁরই উপাসনা।

সেই নষ্ট সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হতে হলে আমাদের প্রথমে রজঃ দ্বারা তমঃ, পরে সত্ত্ব দ্বারা রজঃকে জয় করতে হবে। সত্ত্ব অর্থে সেই স্থির, ধীর, প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধীরে বাড়্তে বাড়্তে শেষে অন্যান্য ভাব অর্থাৎ রজঃ তমঃ একেবারে চলে যাবে। বন্ধন ছিঁড়ে

ফেলে দাও, মুক্ত হও, যথার্থ 'ঈশ্বরতনয়' হও, তবেই যীশুর মত পিতাকে দেখতে পাবে। ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বলতে অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য্য বুঝায়। দুর্ব্বলতা, দাসত্ব ত্যাগ কর। যদি তুমি মুক্তস্বভাব হও, তবেই তুমি কেবলমাত্র আত্মা; যদি মুক্তস্বভাব হও, তবেই অমৃতত্ব তোমার করতলগত; তবেই বলি ঈশ্বর যথার্থ আছেন—যদি তিনি মুক্তস্বভাব হন।

জগৎটা আমার জন্য, আমি কখন জগতের জন্য নই। ভালমন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা কখনও তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব হচ্ছে—যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় পড়ে থাকা; মানুষের স্বভাব মন্দ ত্যাগ করে ভালটা পাবার চেষ্টা করা। আর দেবতার স্বভাব—ভালমন্দ কিছুর জন্য চেষ্টা থাকবে না—সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আনন্দময় হয়ে থাকা। আমাদের দেবতা হতে হবে। হৃদয়টাকে সমুদ্রের মত মহান করে ফেল; জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবসকলের পারে চলে যাও; এমন কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যাও; জগৎটাকে একটা ছবির মত দেখ; এইটি জেনে রাখ যে, জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে পারে না; আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ কর। জগতের সুখ কি রকম জান?—যেমন ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করতে করতে কাদার মধ্য থেকে কাচের মালা কুড়িয়ে পেয়েছে। জগতের সুখদুঃখের উপর শান্তভাবে দৃষ্টিপাত কর, ভালমন্দ উভয়কেই এক বলে দেখ—উভয়ই ভগবানের খেলা, সুতরাং ভালমন্দ, সুখদুঃখ—সবেতেই আনন্দ কর।

* * *

গুরু মহারাজ বলতেন, "সবই নারায়ণ বটে, কিন্তু বাঘ-নারায়ণের

কাছ থেকে সরে থাকতে হয়। সব জলই নারায়ণ বটে, তবে ময়লা জল খাওয়া যায় না।"

"গগনময় থালে রবিচন্দ্র-দীপক জ্বলে"—অন্য মন্দিরের আর কি দরকার? "সব চক্ষু তোমার চক্ষু, অথচ তোমার চক্ষু নাই; সব হস্ত তোমার হস্ত, অথচ তোমার হস্ত নাই।"*

কিছু পাবারও চেষ্টা করো না, কিছু ছাড়বারও চেষ্টা কারে না—হেয়োপাদেয়বর্জ্জিত হও, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হয়। কোন কিছুতে যখন তোমায় বিচলিত করতে পারবে না, তখনই তুমি মুক্তি বা স্বাধীনতা-পদবী লাভ করেছ, বুঝতে হবে। কেবল সহ্য করে গেলে হবে না। একেবারে অনাসক্ত হও। সেই ষাঁড়ের গল্পটি মনে রেখো। একটা মশা অনেকক্ষণ ধরে একটা ষাঁড়ের শিঙ্গে বসেছিল—অনেকক্ষণ বসবার পর তার ঔচিত্যবুদ্ধি জেগে উঠল; হয়ত ষাঁড়ের শিঙ্গে বসে থাকার দরুণ তার বড় কষ্ট হচ্ছে—এই মনে করে সে ষাঁড়কে সম্বোধন করে বলতে লাগল, 'ভাই ষাঁড়, আমি অনেকক্ষণ তোমার শিঙ্গের উপর বসে আছি, বোধ হয় তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমায় মাপ করো, এই আমি উড়ে যাচ্ছি।' ষাঁড় বল্‌লে, 'না, না, তুমি সপরিবারে এসে আমার শিঙ্গে বাস কর না—আমার তাতে কি এসে যায়?'

২৬শে জুন, বুধবার

যখন আমাদের অহংজ্ঞান থাকে না, তখনই আমরা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারি, অপরকে আমাদের ভাবে সবচেয়ে বেশী

---

* অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা।
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৯

অভিভূত করতে পারি। বড় বড় প্রতিভাশালী লোকেরা সকলেই একথা জানেন। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ কর্ত্তা—তাঁর কাছে হৃদয় খুলে দাও, নিজে নিজে কিছু কর্‌তে যেওনা। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বল্‌ছেন, 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।'—'হে অর্জ্জুন, ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য বলে কিছুই নেই'। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হও, তা হলেই তোমার দ্বারা কিছু কাজ হবে। যে সকল শক্তিতে কাজ হয়, তাদের ত আর আমরা দেখ্‌তে পাই না, আমরা কেবল তাদের ফলটা দেখ্‌তে পাই মাত্র। অহংকে সরিয়ে দাও, নাশ করে ফেল, ভুলে যাও; তোমার ভিতর দিয়ে ঈশ্বর কাজ করুন—এ ত তাঁরই কাজ, তিনি বুঝুন। আমাদের আর কিছু কর্‌তে হবে না—কেবল সরে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে কাজ কর্‌তে দেওয়া। আমরা যত সরে যাব, ততই ঈশ্বর আমাদের ভিতর আসবেন। 'কাঁচা আমি'টাকে নষ্ট করে ফেল—কেবল 'পাকা আমি'টাই থেকে যাক্।

আমরা এখন যা হয়েছি, তা আমাদের চিন্তাগুলোরই ফলস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কি চিন্তা কর, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বাক্য ত গৌণ জিনিস। চিন্তাগুলোই বহুকালস্থায়ী, আর তাদের গতিও বহুদূরব্যাপী। আমরা যে কোন চিন্তা করি, তাতে আমাদের চরিত্রের ছাপ লেগে যায়; এই হেতু সাধুপুরুষদের ঠাট্টায় বা গালে পর্য্যন্ত তাঁদের হৃদয়ের ভালবাসা ও পবিত্রতার একটুখানি রয়ে যায় এবং তাতে আমাদের কল্যাণসাধনই করে।

কিছুমাত্র কামনা করো না। ঈশ্বরের চিন্তা কর, কিন্তু কোন ফলকামনা করো না। যাঁরা কামনাশূন্য, তাঁদেরই কাজ ফলপ্রসূ। ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীরা লোকের দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম বহন করে নিয়ে যান

কিন্তু তাঁরা মনে করেন, আমরা কিছুই করছি না। তাঁরা কোনরূপ দাবিদাওয়া করেন না, তাঁদের কাজ তাঁদের অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। যদি তাঁরা (ঐহিক) জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফল* খান, তা হলে ত তাঁদের অহঙ্কার এসে যাবে, আর যা কিছু লোককল্যাণ তাঁরা করবেন—সব লোপ হয়ে যাবে। যখনই আমরা 'আমি' এই কথা বলি, তখনই আমরা আহাম্মক বনি, আর বলে যাই—আমরা 'জ্ঞান'লাভ করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'চোকঢাকা বলদের মত' ঘানিতেই ক্রমাগত ঘুরছি। ভগবান্ অতি উত্তমরূপে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন, তাই তাঁর কাজও সর্ব্বোত্তম। এইরূপ যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখ্‌তে পারেন, তিনি সবচেয়ে বেশী কাজ করতে পারেন। নিজেকে জয় কর, তা হলেই সমুদয় জগৎ তোমার পদতলে আসবে।

সত্ত্বগুণে অবস্থিত হলে আমরা সকল বস্তুর আসল স্বরূপ দেখ্‌তে পাই, তখন আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলে যাই। অহংই সেই বজ্রদৃঢ় প্রাচীর, যা আমাদিগকে বদ্ধ করে রেখেছে—সত্যের মুক্ত বাতাসে যেতে দিচ্ছে না—সকল বিষয়েই, সকল কাজেই তাইতে 'আমি আমার' এই ভাব মনে এনে দেয়—আমরা ভাবি, আমি অমুক কাজ করেছি, তমুক কাজ করেছি, ইত্যাদি। এই ক্ষুদ্র আমিত্বভাবটাকে দূর করে দাও, আমাদের মধ্যে এই যে অহংরূপ পৈশাচিক ভাব রয়েছে, তাকে একেবারে মেরে

---

* বাইবেলে বর্ণিত আছে, প্রথমসৃষ্ট মানবমানবী আদম ও ইভকে ঈশ্বর নন্দনকাননে স্থাপন করে তথাকার জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সয়তানের প্ররোচনায় তাই খেয়ে পূর্ব্বের নিষ্পাপ স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হন। এখানে জ্ঞান অর্থে সুখদুঃখ, ভালমন্দ প্রভৃতি আপেক্ষিক জ্ঞান।

ফেল। 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু' এই মন্ত্র উচ্চারণ কর, প্রাণে প্রাণে এটা অনুভব কর, জীবনে ঐ ভাবটাকে নিয়ে এস। যতদিন না এই অহংভাব-গঠিত জগৎটাকে ত্যাগ করতে পারছি, ততদিন আমরা কখনই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না, কেউ কখনও পারে নি, আর পারবেও না। সংসারত্যাগ করা মানে—এই 'অহং'টাকে একেবারে ভুলে যাওয়া, অহংটার দিকে একেবারে খেয়াল না রাখা; দেহে বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যেন আমরা দেহের না হয়ে যাই। এই বজ্জাৎ 'আমি'টাকে একেবারে নষ্ট করে ফেলতে হবে। লোকে যখন তোমায় মন্দ বলবে, তুমি তাদের আশীর্ব্বাদ করো; ভেবে দেখো তারা তোমার কত উপকার করছে; অনিষ্ট যদি কারও হয়, ত কেবল তাদের নিজেদের হচ্ছে। এমন জায়গায় যাও, যেখানে লোকে তোমাকে ঘৃণা করে; তারা তোমার অহংটাকে মেরে মেরে তোমার ভিতর থেকে বার করে দিক্—তুমি তা হলে ভগবানের খুব কাছে এগুবে। বানরী যেমন তার বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে থাকে কিন্তু পরিশেষে বাধ্য হলে তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে পদদলিত করতেও পশ্চাৎপদ হয় না, সেইরূপ আমরাও সংসারটাকে যতদিন পারি আঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্তু অবশেষে যখন তাকে পদদলিত করতে বাধ্য হই, তখনই আমরা ঈশ্বরের কাছে যাবার অধিকারী হই। ধর্ম্মের জন্য যদি অপরের অত্যাচার সহ্য করতে হয় ত আমরা ধন্য; যদি আমরা লিখতে পড়তে না জানি ত আমরা ধন্য; আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে তফাৎ করবার জিনিস অনেক কমে গেল।

ভোগ হচ্ছে লক্ষফণা সাপ—তাকে আমাদের পদদলিত করতে হবে। আমরা ভোগ ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগলাম; কিছুই না পেয়ে হয়ত আমাদের নৈরাশ্য এল। কিন্তু লেগে থাক, লেগে থাক—কখনই ছেড়ো

না। এই সংসারটা একটা পিশাচের মত। এ সংসার যেন একটা রাজ্য—আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' যেন তার রাজা। তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াও। কামকাঞ্চন, নামযশ ত্যাগ করে দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে ধরে থাক, অবশেষে আমরা সুখদুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীনতা লাভ করব। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতাই সুখ, এ ধারণা সম্পূর্ণ জড়বাদাত্মক। ওতে এক কণাও যথার্থ সুখ নেই ; যা কিছু সুখ, তা সেই প্রকৃত আনন্দের প্রতিবিম্বমাত্র।

যাঁরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা তথাকথিত কর্ম্মীদের চেয়ে জগতের জন্য অনেক বেশী কাজ করেন। আপনাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করেছে, এমন একজন লোক হাজার ধর্ম্মপ্রচারকের চেয়ে বেশী কাজ করে। চিত্ত-শুদ্ধি ও মৌন থেকেই কথার ভিতর জোর আসে।

পদ্মের মত হও। পদ্ম এক জায়গায়ই থাকে, কিন্তু যখন ফুটে ওঠে, তখন চারদিক থেকে মৌমাছি আপনি এসে জোটে। *

শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের ভিতর পাপ বা অশুভ দেখতে পেতেন না—তিনি জগতে কিছু মন্দ দেখতে পেতেন না, কাজেই সেই মন্দ দূর করবার জন্য চেষ্টা করারও কোন প্রয়োজন দেখতেন না। আর কেশবচন্দ্র একজন মস্ত ধর্ম্মসংস্কারক, নেতা এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ সাধনান্তে এই শান্তপ্রকৃতি দক্ষিণেশ্বরবাসী মহাপুরুষ শুধু ভারতে নয়, সমগ্র জগতের ভাবরাজ্যে এক মহা ওলট্‌পালট্‌ এনে দিয়ে গেছেন। এই সকল নীরব মহাপুরুষ বাস্তবিক মহাশক্তির আধার—তাঁরা প্রেমে

---

* অর্থাৎ নিজে সাধন-ভজন করিয়া চরিত্রের উন্নতিসাধন কর। তোমাদের জ্ঞানভক্তির সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া লোকে আপনি আসিয়া তোমাদের নিকট শিক্ষা করিবে, তোমাদের কোথাও ছুটাছুটি করিয়া প্রচার করিতে যাইতে হইবে না।

তন্ময় হয়ে জীবনযাপন করে ভবরঙ্গমঞ্চ হতে সরে যান। তাঁরা কখন 'আমি আমার' বলেন না। তাঁরা আপনাদিগকে ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করেই ধন্য মনে করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণই খ্রীষ্ট ও বুদ্ধসকলের জন্মদাতা। তাঁরা সদাই ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণভাবে তাদাত্ম্য লাভ করে এই বাস্তবজগৎ থেকে বহুদূরে এক আদর্শজগতে বাস করেন। তাঁরা কিছুই চান না এবং জ্ঞাতসারে কিছু করেনও না। তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে জগতের সর্ব্বপ্রকার উচ্চভাবের প্রেরকস্বরূপ—তাঁরা জীবন্মুক্ত, একেবারে অহংশূন্য। তাঁদের ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান একেবারে উড়ে গেছে, নামযশের আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নেই। তাঁদের ব্যক্তিত্ব সব লোপ হয়ে গেছে, তাঁরা নিরাকার তত্ত্বস্বরূপ।

২৭শে জুন, বৃহস্পতিবার

(স্বামীজি অদ্য বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট লইয়া আসিলেন এবং পুনর্ব্বার জনের গ্রন্থ পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।)

যীশুখ্রীষ্ট যে শান্তিদাতা পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন, মহম্মদ আপনাকে সেই শান্তিদাতা বলে দাবি করতেন।* তাঁর মতে যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক ভাবে জন্ম হয়েছিল—একথা স্বীকার করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। সকল যুগে, সকল দেশেই এইরূপ দাবি দেখতে পাওয়া যায়। সকল বড়লোকেই—দেবতা হতে তাঁদের জন্ম হয়েছে—এই দাবি করে গেছেন।

জ্ঞান জিনিসটা আপেক্ষিক মাত্র। আমরা ঈশ্বর হতে পারি, কিন্তু তাঁকে কখন জানতে পারি না। জ্ঞান একটা নিম্নতর অবস্থামাত্র। তোমাদের বাইবেলেও আছে, আদম যখন 'জ্ঞানলাভ করলেন,' তখনই

---

* যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইব বটে; কিন্তু আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য শান্তিদাতাকে (Comforter) পাঠাইয়া দিব। খ্রীষ্টানেরা বলেন, এই Comforter, Holy Ghost—বা পবিত্রাত্মারূপী ঈশ্বর।

তাঁর পতন হল। তার পূর্ব্বে তিনি স্বয়ং সত্যস্বরূপ, পবিত্রতা-স্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ ছিলেন। আমাদের মুখ আমাদের থেকে কিছু পৃথক্ পদার্থ নয়, কিন্তু আমরা কখন আসল মুখটাকে দেখতে পাই না, আমাদের তার প্রতিবিম্বমাত্র দেখতে হয়। আমরা নিজেরাই প্রেমস্বরূপ, কিন্তু যখন ঐ প্রেমসম্বন্ধে চিন্তা করতে যাই, তখনই দেখি, আমাদের একটা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাতেই প্রমাণ হয় যে আমরা যাকে জড় বলি, সেটা চিৎ-এর বহিরভিব্যক্তিমাত্র।

নিবৃত্তি অর্থে সংসার থেকে সরে আসা। হিন্দুদের পুরাণে আছে, প্রথম সৃষ্ট চারিজন ঋষিকে* হংসরূপী ভগবান্ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, সৃষ্টিপ্রপঞ্চ গৌণমাত্র; সুতরাং তাঁরা আর প্রজা সৃষ্টি করলেন না। এর তাৎপর্য্য এই যে, অভিব্যক্তির অর্থ ই অবনতি; কারণ, আত্মাকে অভিব্যক্ত করতে গেলে শব্দ দ্বারা ঐ অভিব্যক্তি সাধিত হয়, আর 'শব্দ ভাবকে নষ্ট করে ফেলে'।† তা হলেও, তত্ত্ব জড়াবরণে আবৃত না হয়ে থাকতে পারে না, যদিও আমরা জানি যে অবশেষে এইরূপ আবরণের দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে আমরা আসলটাকেই হারিয়ে ফেলি। সকল বড় বড় আচার্য্যই একথা বুঝেন, আর সেইজন্যই অবতারেরা পুনঃ পুনঃ এসে আমাদের মূল তত্ত্বটি বুঝিয়ে দিয়ে যান আর সেইকালের উপযোগী তার একটি নূতন আকার দিয়ে যান। গুরুমহারাজ বলতেন, ধর্ম্ম এক; সকল অবতারেরাই এই কথাই শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তবে সকলকেই সেই তত্ত্বটি প্রকাশ করতে কোন না কোন আকার দিতে হয়। সেইজন্য তাঁরা তাকে তার পুরাতন আকারটি হতে উঠিয়ে নিয়ে একটি নূতন আকারে আমাদের সামনে ধরেন।

* সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার

† "The letter killeth"—বাইবেল, ২য় করিন্থিয়ান, ৩য় অঃ, ৬ষ্ঠ শ্লোক

যখন আমরা নামরূপ থেকে বিশেষতঃ দেহ থেকে মুক্ত হই, যখন আমাদের ভালমন্দ কোন দেহের প্রয়োজন থাকে না, তখনই কেবল আমরা বন্ধন অতিক্রম করতে পারি। অনন্ত উন্নতি মানে অনন্তকালের জন্য বন্ধন; তার চেয়ে সকল রকম আকৃতির ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়। আমাদের সর্ব্বরকম দেহ, এমন কি দেবদেহ থেকেও মুক্তিলাভ করতে হবে। ঈশ্বরই একমাত্র যথার্থ সত্যবস্তু, দুটি সত্যবস্তু কখনও থাকতে পারে না। একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং আমিই সেই।

কেবল মুক্তিলাভের সহায়ক বলেই শুভকর্ম্মের যা মূল্য। তার দ্বারা কর্ত্তারই কল্যাণ হয়, অপর কারও কিছু হয় না।

* * * *

জ্ঞান মানে শ্রেণীবদ্ধ করা—কতকগুলি জিনিসকে এক শ্রেণীর ভিতর ফেলা। আমরা এক প্রকারের অনেকগুলি জিনিসকে দেখলাম—দেখে সেই সবগুলিকে কোন একটা নাম দিলাম, তাতেই আমাদের মন শান্ত হল। আমরা কেবল কতকগুলি 'ঘটনা' বা 'ব্যাপার' আবিষ্কার করে থাকি, কিন্তু 'কেন' সেগুলি ঘটছে, তা জানতে পারি না। আমরা অজ্ঞানেরই আরও খানিকটা বেশী জায়গা ব্যেপে এক পাক ঘুরে এসে মনে করি, আমরা কিছু জ্ঞানলাভ করলাম। এই জগতে 'কেন'র কোন উত্তর পাওয়া যেতে পারে না; 'কেন'র উত্তর পেতে হলে আমাদিগকে ভগবানের কাছে যেতে হবে। যিনি সকলের জ্ঞাতা, তাঁকে কখন প্রকাশ করা যায় না। এ যেন নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে যাওয়া—যেমন নামল, অমনি গলে সমুদ্রে মিশে গেল।

বৈষম্যই সৃষ্টির মূল—একরসতা বা সাম্যই ঈশ্বর। এই বৈষম্যভাবের পারে চলে যাও; তা হলেই জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই জয় করবে,

এবং অনন্ত সমষ্টে পৌছুবে—তখনই তোমরা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হবে। মুক্তিলাভ কর্‌বার চেষ্টা কর, তাতে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার। একখানা বইয়ের সঙ্গে তার পাতাগুলোর যে সম্বন্ধ, আমাদের সঙ্গে আমাদের জন্মগুলোরও সেই সম্বন্ধ; আমরা কিন্তু অপরিণামী, সাক্ষিস্বরূপ, আত্মস্বরূপ; আর তাঁরই উপর জন্মান্তরের ছায়া পড়্‌ছে; যেমন একটা মশাল খুব জোরে জোরে ঘোরাতে থাক্‌লে চোকে একটা বৃত্তাকার প্রতীতি হয়। আত্মাতেই সমস্ত ব্যক্তিত্বের একত্ব; আর যেহেতু আত্মা অনন্ত, অপরিণামী ও অচঞ্চল, সেই হেতু আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। আত্মাকে জীবন বল্‌তে পারা যায় না, কিন্তু তাই থেকে সমুদয় জীবন গঠিত হয়। একে সুখ বলা যায় না, কিন্তু এই থেকেই সুখের উৎপত্তি হয়।

* * * *

আজকাল জগতের লোকে ভগবান্‌কে পরিত্যাগ কর্‌ছে, কারণ লোকের ধারণা—জগতের যতদূর সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান করা উচিত, তা তিনি কর্‌ছেন না; এই হেতু লোকে বলে থাকে, "তাঁকে নিয়ে আমাদের লাভ কি?" আমাদের কি ঈশ্বরকে কেবল একজন মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তা বলে ভাব্‌তে হবে নাকি?

আমরা এইটুকু করতে পারি যে, আমাদের সব বাসনা, ঈর্ষা, ঘৃণা, ভেদবুদ্ধি—এইগুলিকে দূর করে দিতে পারি। 'কাঁচা আমি'কে নষ্ট করে ফেলতে হবে, মনকে মেরে ফেলতে হবে—একরকম মানসিক আত্মহত্যা আর কি! শরীর ও মনকে পবিত্র ও সুস্থ রাখ—কিন্তু কেবল ঈশ্বরলাভ কর্‌বার যন্ত্রস্বরূপে; ঐটুকুই এদের একমাত্র যথার্থ প্রয়োজন। কেবল সত্যের জন্যই সত্যের অনুসন্ধান কর, তার দ্বারা

আনন্দলাভ হবে, একথা ভেবো না। আনন্দ আপনা হতে আস্‌তে পারে, কিন্তু তাই যেন তোমার সত্যলাভ কর্‌বার প্ররোচক না হয়। ঈশ্বর-লাভ ব্যতীত অন্য কোন অভিসন্ধি রেখো না। সত্যলাভ কর্‌তে হলে যদি নরকের ভিতর দিয়েও যেতে হয়, তাতেও পেছ্‌পা হয়ো না।

২৮শে জুন, শুক্রবার

(অদ্য সকলেই স্বামীজির সহিত এক স্থানে বনভোজনে যাত্রা করিয়াছিলেন। যদিও স্বামীজি যেখানেই থাকিতেন, তথায়ই তাঁহার উপদেশ-দানের বিরাম ছিল না, কিন্তু অদ্যকার উপদেশের কোন প্রকার 'নোট্‌' রাখা হয় নাই। তবে বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রাতরাশের সময় তিনি এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রকার অন্নের জন্য ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হও—অন্নই ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁর সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিই আমাদের ব্যষ্টিশক্তিতে পরিণত হয়ে আমাদের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য কর্‌তে সাহায্য করে থাকে।

২৯শে জুন, শনিবার

(অদ্য স্বামীজি গীতা হস্তে লইয়া উপস্থিত হইলেন।)

গীতায় হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবাত্মাগণের ঈশ্বর গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রার অধীশ্বর বা নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই জগৎই 'ধর্ম্মক্ষেত্র' কুরুক্ষেত্র। পঞ্চপাণ্ডব (অর্থাৎ ধর্ম্ম) শত কৌরবের (আমরা যে সকল বিষয়ে আসক্ত এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সতত বিরোধ তাদের) সহিত যুদ্ধ কর্‌ছেন! পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর অর্জ্জুন (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জীবাত্মা) সেনাপতি। আমাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়সুখের সঙ্গে—যুদ্ধ কর্‌তে হবে, তাদের মেরে ফেল্‌তে হবে।

আমাদের নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতে হবে। আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, আমাদের আর সমস্ত ভাবকে এই ভাবে ডুবিয়ে দিতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার আসক্তিবর্জ্জিত হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখন সংসারী হয়ে যান নি। সকল কাজ কর, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর; কাজের জন্যই কাজ কর, নিজের জন্য কখনও করো না।

* * * *

নামরূপাত্মক কোন কিছু কখন মুক্তস্বভাব হতে পারে না। মৃত্তিকা থেকে যেমন নামরূপের দ্বারা ঘটাদি হয়, সেইরূপ সেই মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম সসীম বা বদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েন; সুতরাং আপেক্ষিক সত্তাকে কখন মুক্তস্বভাব বলা যেতে পারে না। ঘট যতক্ষণ ঘট থাকে, ততক্ষণ আপনাকে কখনই মুক্ত বল্‌তে পারে না, যখনই সে নামরূপ ভুলে যায়, তখনই মুক্ত হয়। সমুদয় জগৎটাই আত্মস্বরূপ—বহুভাবে অভিব্যক্ত, যেন এক সুরের মধ্যেই নানা রঙ পরঙ তোলা হয়েছে—তা না হলে একঘেয়ে হয়ে পড়্‌ত। সময়ে সময়ে বেসুর বাজে বটে, তাতে বরং পরবর্ত্তী সুরের ঐক্যটা আরও মিষ্ট লাগে। মহান্ বিশ্বসঙ্গীতে তিনটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়,—সাম্য, বল ও স্বাধীনতা।

যদি তোমার স্বাধীনতায় অপরের কিছু ক্ষতি হয়, তা হলে বুঝ্‌তে হবে, সে স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। অপরের কোন প্রকার ক্ষতি কখন করো না।

মিল্টন বলেছেন, "দুর্ব্বলতাই দুঃখ।" কর্ম্ম ও ফলভোগ—এই দুটির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। (অনেক সময়েই দেখা যায়, যে হাসে বেশী, তাকে

কাঁদতে হয়ও বেশী—যত হাসি তত কান্না) "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।

* * * *

জড়ভাবে দেখলে কুচিন্তাগুলিকে রোগবীজাণু বলা যেতে পারে। আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মত, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ির ঘা মারা—তাই দিয়ে আমরা দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা গঠন করি।

আমরা জগতের সমুদয় সুচিন্তারাশির উত্তরাধিকারিস্বরূপ, কিন্তু সেগুলিকে আমাদের মধ্যে অবাধে আস্‌তে দেওয়া চাই।

শাস্ত্র ত সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। মূর্খ, শুন্‌তে পাচ্ছ না কি, তোমার নিজ হৃদয়ে দিবারাত্র সেই অনন্ত সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে—"সচ্চিদানন্দঃ সচ্চিদানন্দঃ, সোঽহং সোঽহম্।"

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা—সকলেরই ভিতর অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে। প্রকৃত ধর্ম্ম একমাত্র, আমরা তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে, তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করে মরি। যারা খুঁজতে জানে তাদের কাছে সত্যযুগ ত বর্ত্তমানই রয়েছে। আমরা নিজেরাই নষ্ট হয়েছি, আর জগৎকে নষ্ট মনে করছি।

এ জগতে পূর্ণশক্তির কোন কার্য্য থাকে না। তাকে কেবল 'অস্তি' বা 'সৎ' মাত্র বলা যায়, তার কোন কার্য্য থাকে না।

যথার্থ সিদ্ধিলাভ এক বটে, তবে আপেক্ষিক সিদ্ধি নানাবিধ হতে পারে।

৩০শে জুন, রবিবার

একটা কিছু কল্পনা আশ্রয় না করে চিন্তা করবার চেষ্টা আর

অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা—এক কথা। আমরা কোন একটি বিশেষ স্তন্যপায়ী জীবকে অবলম্বন না করে স্তন্যপায়ী জীবমাত্রের কোন ধারণা করতে পারি না। ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধেও ঐ কথা।

জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে সূক্ষ্ম সার নিষ্কর্ষ, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি।

প্রত্যেক চিন্তার দুটি ভাগ আছে—একটি হচ্ছে ভাব, আর দ্বিতীয়টি ঐ ভাবদ্যোতক 'শব্দ'—আমাদের ঐ দুটিকেই নিতে হবে। কি বিজ্ঞানবাদী (Idealist), কি জড়বাদী (Materialist), কারও মত খাঁটি সত্য নয়। আমাদের ভাব ও তার প্রকাশ দুই-ই নিতে হবে।

আমরা আরসিতেই আমাদের মুখ দেখ্‌তে পাই—সমুদয় জ্ঞানও সেই-রকম যা বাইরে প্রতিবিম্বিত হয় তারই জ্ঞান। কেউ কখন তার নিজের আত্মা বা ঈশ্বরকে জান্‌তে পারবে না, কিন্তু আমরা স্বয়ংই সেই আত্মা, আমরাই ঈশ্বর।

তোমার তখনই নির্ব্বাণ-অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 'তুমিত্ব' একেবারে উড়ে যাবে। বুদ্ধ বলেছিলেন—"যখন 'তুমি' থাক্‌বে না, (অর্থাৎ যখন কাঁচা আমিটা চলে যাবে) তখনই তোমার যথার্থ অবস্থা—তখনই তোমার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।"

অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। যেন একটা লোহার পিপের ভিতর একটা আলো রাখা হয়েছে, ঐ আলোর এতটুকু জ্যোতিঃও বাইরে আস্‌তে পারছে না। একটু একটু করে পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করতে করতে আমরা ঐ মাঝখানকার আড়ালটাকে খুব পাতলা করে ফেল্‌তে পারি। অবশেষে সেটা কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণে যেন ঐ

লোহার পিপে কাচে পরিণত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে সেই আভ্যন্তরীণ জ্যোতিঃ ঠিক ঠিক দেখা যাচ্ছে। আমরা সকলেই এক সময়ে না এক সময়ে এইরূপ কাচের পিপে হব—এমন কি, এর চেয়েও উচ্চ উচ্চ বিকাশের আধারভূত হব। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আদৌ কোন পিপে রয়েছে, ততদিন আমাদের জড় উপায়ের সাহায্যেই চিন্তা করতে হবে। অসহিষ্ণু ব্যক্তি কোন কালে সিদ্ধ হতে পারে না।

* * * *

বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তত্ত্বের (Principle) দৃষ্টান্তস্বরূপ; কিন্তু শিষ্যেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ত্ব করে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া করতে করতে তত্ত্বটা ভুলে যায়।

বুদ্ধের সগুণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তর্ক করার ফলে ভারতে প্রতিমাপূজার সূত্রপাত হল! বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্ব ছিল না, তখন লোকে সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন করত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে আমরা জগৎস্রষ্টা ও আমাদের সখাস্বরূপ ঈশ্বরকে হারালাম, আর তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিমাপূজার উৎপত্তি হল। লোকে বুদ্ধের মূর্ত্তি গড়ে পূজা করতে আরম্ভ করলে। যীশুখ্রীষ্ট-সম্বন্ধেও তাই হয়েছে। কাঠ-পাথরে পূজা থেকে যীশু-বুদ্ধের পূজা পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রতিমা-পূজা, কিন্তু কোন না কোনরূপ মূর্ত্তি ব্যতীত আমাদের চল্‌তে পারে না।

* * * *

জোর করে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে তাতে সংস্কার বা উন্নতির গতি রোধ হয়। কাউকে বলো না—'তুমি মন্দ'। বরং তাকে বল—'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও।'

পুরুতরা সব দেশেই অনিষ্ট করে থাকে; কারণ তারা লোককে গাল

দেয় ও তাদের কুসমালোচনা করে। তারা একটা দড়ি ধরে টান দেয়, মনে করে সেটাকে ঠিক করবে, কিন্তু তার ফলে আর দু তিনটা দড়ি স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। প্রেমে কখন গাল মন্দ করে না, শুধু প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই ঐ রকম করে থাকে। ন্যায়সঙ্গত রাগ বা বৈধ হিংসা বলে কোন জিনিস নেই।

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধূর্ত্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তিস্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে। তার কারণ, পুরুষে তার উপর অত্যাচার করছে। এখন সে শৃগালীর মত; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণতঃ ধর্ম্মভাবকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। তা না হলে ঐ ভাবের অবনতি হয়ে ওটা ভাবুকতামাত্রে পরিণত হতে পারে।

* * * *

আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, এই পরিণামী জগতের পশ্চাতে একটা অপরিণামী বস্তু আছে,—যদিও সেই চরম পদার্থের ধারণা-সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদ আছে। বুদ্ধ এটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, "ব্রহ্ম বা আত্মা বলে কিছু নেই।"

চরিত্র হিসাবে জগতের মধ্যে বুদ্ধ সকলের চেয়ে বড়; তার পর খ্রীষ্ট। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান্ উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই সকল বিরল মহাত্মাদের মধ্যে একজন, যাঁদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের স্রোত বয়ে যায়। যিনি গীতা

লিখেছেন, তাঁর মত আশ্চর্য্য মাথা মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখ্‌তে পাবে না!

* * * *

জগতে একটা মাত্র শক্তিই রয়েছে—সেইটেই কখনও মন্দ, কখনও বা ভাল ভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর সয়তান একই নদী—কেবল স্রোতটা পরস্পরের বিপরীত-দিগ্‌গামী।

১লা জুলাই, সোমবার

(শ্রীরামকৃষ্ণদেব)

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা একজন খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন—এমন কি, তিনি সকল প্রকার ব্রাহ্মণের দানও গ্রহণ করতেন না। তাঁর জীবিকার জন্য সাধারণের মত কোন কাজ কর্‌বার জো ছিল না। তাঁর বই বিক্রী কর্‌বার বা কারু চাকরী কর্‌বার জো ত ছিলই না, এমন কি, তাঁর কোন দেবমন্দিরে পৌরোহিত্য কর্‌বারও উপায় ছিল না। তিনি একরূপ আকাশবৃত্তি-অবলম্বী ছিলেন, যা অযাচিত ভাবে উপস্থিত হত, তাতেই তাঁর খাওয়া পরা চল্‌ত; কিন্তু তাও কোন পতিত ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তিনি গ্রহণ কর্‌তেন না। হিন্দুধর্ম্মে দেবমন্দিরের তেমন প্রাধান্য নেই। যদি সব মন্দির নষ্ট হয়ে যায়, তাতেও ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না। হিন্দুদের মতে নিজের জন্য বাড়ী তৈরী করা স্বার্থ-পরতার কার্য্য; কেবল দেবতা ও অতিথিদের জন্য বাড়ী তৈরী করা যেতে পারে। সেই জন্য লোকে ভগবানের নিবাসস্বরূপে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করে থাকে।

অতিশয় পারিবারিক অসচ্ছলতা হেতু শ্রীরামকৃষ্ণ অতি অল্প বয়সে এক মন্দিরে পূজারী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। মন্দিরে জগজ্জননীর মূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাঁকে প্রকৃতি বা কালীও বলে থাকে। একটি স্ত্রীমূর্ত্তি একটি পুরুষমূর্ত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তাতে এই প্রকাশ হচ্ছে যে, মায়াবরণ উন্মোচিত না হলে আমরা জ্ঞানলাভ করতে পারি না। ব্রহ্ম স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই নন—তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তিনি যখন আপনাকে অভিব্যক্ত করেন, তখন তিনি আপনাকে মায়ার আবরণে আবৃত করে জগজ্জননীরূপ ধারণ করেন ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বিস্তার করেন। যে পুরুষমূর্ত্তিটি শয়ানভাবে রয়েছেন, তিনি শিব বা ব্রহ্ম, তিনি মায়াবৃত হয়ে শব হয়েছেন। অদ্বৈতবাদী বা জ্ঞানী বলেন, "আমি জোর করে মায়া কাটিয়ে ব্রহ্মকে প্রকাশ করব।" কিন্তু দ্বৈতবাদী বা ভক্ত বলেন, "আমরা সেই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি দ্বার ছেড়ে দেবেন, আর তখনই ব্রহ্ম প্রকাশিত হবেন, তাঁরই হাতে চাবি রয়েছে।"

প্রতিদিন মা কালীর সেবা-পূজা করতে করতে এই তরুণ পুরোহিতের হৃদয়ে ক্রমে এমন তীব্র ব্যাকুলতা ও ভক্তির উদ্রেক হল যে, তিনি আর নিয়মিত ভাবে মন্দিরের পূজাদি কার্য্য চালাতে পারলেন না। সুতরাং তিনি তা পরিত্যাগ করে মন্দিরের এলাকার ভিতরেই যেখানে এক পাশে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল ছিল, সেইখানে গিয়ে দিবারাত্র ধ্যানধারণা করতে লাগলেন। সেটি ঠিক গঙ্গার উপরেই ছিল; একদিন গঙ্গার প্রবল স্রোতে ঠিক একখানি কুটির-নির্ম্মাণোপযোগী সমুদয় জিনিস-পত্র তাঁর কাছে ভেসে এল। সেই কুটিরে থেকে তিনি ক্রমাগত প্রার্থনা করতে ও কাঁদতে লাগলেন—জগজ্জননী ছাড়া আর কোন বিষয়ের চিন্তা, নিজের দেহরক্ষার চিন্তা পর্য্যন্ত তাঁর রহিল না। তাঁর এক আত্মীয় এই সময়ে তাঁকে দিনের মধ্যে একবার করে খাইয়ে যেতেন, আর তাঁর

তত্ত্বাবধান করতেন। কিছুদিন পর এক সন্ন্যাসিনী এসে তাঁকে তাঁর 'মা'কে পাবার সহায়তা করতে লাগলেন। তাঁর যে কোন প্রকার গুরুর প্রয়োজন হত, তাঁরা আপনা আপনি তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হতেন। সকল সম্প্রদায়ের কোন না কোন সাধু এসে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আর তিনি আগ্রহ করে সকলেরই উপদেশ শুনতেন। তবে তিনি কেবল সেই জগন্মাতারই উপাসনা করতেন—তাঁর কাছে সবই 'মা' বলে মনে হত।

শ্রীরামকৃষ্ণ কারও বিরুদ্ধে কখনও কড়া কথা বলেন নি। তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, সকল সম্প্রদায়ই ভাবত যে, তিনি তাদেরই লোক। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সকল ধর্ম্মই সত্য—তিনি বলতেন, ধর্ম্মজগতে সব ধর্ম্মেরই স্থান আছে। তিনি মুক্তস্বভাব ছিলেন, কিন্তু সকলের প্রতি সমান প্রেমেই তাঁর মুক্তস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যেত, বজ্রবৎ কঠোরতায় নয়। এইরূপ কোমল থাকের লোকেরাই নূতন ভাবের সৃষ্টি করেন, আর 'হাঁক-ডেকে' থাকের লোকে ঐ ভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেন। সেণ্ট পল এই শেষ থাকের ছিলেন। তাই তিনি সত্যের আলোক চতুর্দ্দিকে বিস্তার করেছিলেন।

সেণ্ট পলের যুগ কিন্তু এখন আর নেই। আমাদিগকেই অধুনাতন জগতের নূতন আলোকস্বরূপ হতে হবে। আমাদেব যুগেব এখন বিশেষ প্রয়োজন—এমন একটি সঙ্ঘ, যা আপনা হতেই নিজেকে দেশকালোপযোগী করে নেবে। যখন তা হবে, তখন সেইটেই জগতের শেষ ধর্ম্ম হবে। সংসারচক্র চলবে—আমাদের তাকে সাহায্য করতে হবে, তাকে বাধা দিলে চলবে না। নানাবিধ ধর্ম্মভাবরূপ তরঙ্গ উঠছে পড়ছে, আর সেই সকল তরঙ্গের শীর্ষদেশে সেইযুগের অবতার বিরাজ করছেন। রামকৃষ্ণ বর্ত্তমান যুগের উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা দিতে এসেছিলেন—তাঁর ধর্ম্মে কিছু

ভাঙ্গাচোরা নেই, তাঁর ধর্ম্ম হচ্ছে গড়া। তাঁকে নূতন করে প্রকৃতির কাছে গিয়ে সত্য জান্‌বার চেষ্টা করতে হয়েছিল, ফলে তিনি বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম লাভ করেছিলেন। সে ধর্ম্ম কাউকে কিছু মেনে নিতে বলে না, নিজে পরখ করে নিতে বলে। "আমি সত্য দর্শন কর্‌ছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখ্‌তে পার।"—আমি যে সাধন অবলম্বন করেছি, তুমিও সেই সাধন কর, তা হলে তুমিও আমার মত সত্য দর্শন কর্‌বে। ঈশ্বর সকলের কাছেই আস্‌বেন—সেই সমত্বভাব সকলেরই আয়ত্তের ভিতর রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি হিন্দুধর্ম্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের সৃষ্ট কোন নূতন বস্তু নয়। আর তিনি সেগুলি তাঁর নিজস্ব বলে কখন দাবীও করেন নি; তিনি নামযশের জন্য কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা কর্‌তেন না। তাঁর বয়স যখন প্রায় চল্লিশ, সেই সময় তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ঐ প্রচারের জন্য কখন বাইরে কোথাও যান নি। যারা তাঁর কাছে এসে উপদেশ গ্রহণ কর্‌বে তাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করেছিলেন।

হিন্দুসমাজের প্রথানুযায়ী তাঁর পিতামাতা তাঁর যৌবনের প্রারম্ভে পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। বালিকা এক সুদূর পল্লীতে তাঁর নিজ পরিজনের মধ্যে বাস করতে লাগলেন—তাঁর যুবা পতি যে কি কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তার বিষয় তিনি কিছু জান্‌তেন না। যখন তিনি বয়স্থা হলেন, তখন তাঁর স্বামী ভগবৎপ্রেমে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। তিনি হেঁটে দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি, তাঁর স্বামীকে দেখেই, তাঁর যে কি অবস্থা তা বুঝ্‌তে পার্‌লেন; কারণ, তিনি স্বয়ং মহা বিশুদ্ধা ও উন্নতস্বভাবা ছিলেন। তিনি তাঁর

কার্য্যে কেবল সাহায্য করবারই ইচ্ছা করেছিলেন; তাঁর কখনও এ ইচ্ছা হয় নি যে, তাঁকে গৃহস্থপদবীতে টেনে নামিয়ে আনেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতে মহান্ অবতারপুরুষগণের মধ্যে একজন বলে পূজিত হয়ে থাকেন! তাঁর জন্মদিন তথায় ধর্ম্মোৎসবরূপে পরিগণিত হয়ে থাকে।

* * * *

একটি বিশিষ্টলক্ষণযুক্ত গোলাকার শিলা বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ভগবানের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রাতঃকালে পুরোহিত এসে সেই শালগ্রামশিলাকে পুষ্পচন্দন নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করেন, ধূপকর্পূরাদির দ্বারা আরতি করেন, তার পর তাঁর শয়ন দিয়ে ঐরূপ ভাবে পূজার জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর স্বরূপতঃ রূপবিবর্জ্জিত হলেও, তিনি ঐরূপ প্রতীক বা কোনরূপ জড় বস্তুর সাহায্য ব্যতীত তাঁর উপাসনা করতে পাচ্ছেন না, এই দোষ বা দুর্ব্বলতার জন্য তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি শিলাটিকে স্নান করান, কাপড় পরান এবং নিজের চৈতন্যশক্তি দ্বারা তাঁর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন।

* * * *

একটি সম্প্রদায় আছে, তারা বলে—ভগবানকে কেবল শিব ও সুন্দর-রূপে পূজা করা দুর্ব্বলতামাত্র, আমাদের অশিবরূপকেও ভালবাসতে হবে, পূজা করতে হবে। এই সম্প্রদায় তিব্বত দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আর তাদের ভিতর বিবাহ-পদ্ধতি নেই। ভারতে এই সম্প্রদায়ের প্রকাশ্যভাবে থাকবার জো নেই, সুতরাং তারা গোপনে গোপনে সম্প্রদায় করে থাকে। কোন ভদ্রলোক গুপ্তভাবে ভিন্ন এই সকল সম্প্রদায়ে যোগ দিতে

পারেন না। তিব্বত দেশে তিনবার সমাধিকারবাদ* কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিবারই সে চেষ্টা বিফল হয়। তারা খুব তপস্যা করে থাকে, আর শক্তি (বিভূতি) লাভ হিসাবে তাতে খুব সফলতা লাভও করে থাকে।

'তপস্' শব্দের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 'তপ্ত' বা উত্তেজিত কর্‌বার সাধনা বা প্রক্রিয়াবিশেষ। যমন, হয়ত উদয়াস্ত জপ করা—সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ক্রমাগত ওঙ্কারজপ। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্মায়, যাকে আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক যে কোন রূপে ইচ্ছা, পরিণত করা যেতে পারে। এই তপস্যার ভাব সমগ্র হিন্দুধর্ম্মে ওতপ্রোত রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগৎসৃষ্টি করবার জন্যে তপস্যা কর্‌তে হয়েছিল। এটা যেন মানসিক যন্ত্রবিশেষ—এ দিয়ে সব করা যেতে পারে। শাস্ত্রে আছে—"ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপস্যা দ্বারা পাওয়া না যেতে পারে।"

*   *   *   *

যে সব লোক এমন সব সম্প্রদায়ের মতামত বা কার্য্যকলাপের বর্ণনা করে, যাদের সঙ্গে তাদের সহানুভূতি নেই, তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মিথ্যাবাদী। যারা সম্প্রদায়বিশেষে দৃঢ়বিশ্বাসী তারা অপর সম্প্রদায়ে যে সত্য আছে, তা বড় একটা দেখ্‌তে পায় না।

*   *   *   *

ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আজ মাসের

* Communism—কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত নয়, সকলের সাধারণ সম্পত্তি থাকিবে, এই মত।

কোন্ তারিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, "রামই আমার সন তারিখ সব। আমি আর কোনও সন তারিখ জানি না।"

২রা জুলাই, মঙ্গলবার

(জগজ্জননী)

শাক্তেরা জগতের সেই সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকে মা বলে পূজা করে থাকেন—কারণ, মা নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রীচরিত্রের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, মুক্তি হয়,—এর দ্বারা কখন ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের—রুদ্রমূর্ত্তির উপাসনাকে বামাচার বা বামমার্গ বলে; সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হয়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি এসে থাকে, আর যারা তার সাধন করে, সেই জাতির একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ, আর জনকের ধারণা থেকে জননীর ধারণা ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হয়ে থাকে। মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্ব্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে, শিশু যেমন আপনার মাকে সর্ব্বশক্তিমতী মনে করে থাকে—মা সব করতে পারে! সে জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে উপাসনা না করে আমরা কখন নিজেদের জানতে পারি না।

সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার সমষ্টিস্বরূপিণী। জগতে

যত শক্তির বিকাশ দেখা দেখা যায়, সবই সেই জগদম্বা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনি প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতর রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি একজন ব্যক্তি—তাঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন রামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। তিনি অতি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি যখন ইচ্ছা যে কোনরূপে আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম রূপ দুই-ই থাকতে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাঁকে এই সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নাম-রূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধসত্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন কোন শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি (cells) মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক একটি কোষ-স্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর—আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা মা বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্ত-স্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নির্গুণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ, দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিত্বভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা—যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক; এইটিই বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব।

সেই জগদম্বার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খ্রীষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহত্ত্বলাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

৩রা জুলাই, বুধবার

মোটামুটি বলতে গেলে বলা যায়, ভয়েতেই মানুষের ধর্ম্মের আরম্ভ। "ঈশ্বরভীতিই জ্ঞানের আরম্ভ।" কিন্তু পরে তা থেকে এই উচ্চতর ভাব আসে যে, "পূর্ণ প্রেমের উদয়ে ভয় দূরে যায়।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা জ্ঞানলাভ করছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা ঈশ্বর কি বস্তু জানতে পারছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু না কিছু ভয় থাকবেই। যীশুখ্রীষ্ট মানুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি জগতে অপবিত্রতা দেখতে পেতেন— আর তার খুব নিন্দাও করে গেছেন। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ, তিনি জগতে কিছু অন্যায় দেখতে পান না, সুতরাং তাঁর ক্রোধেরও কোন কারণ নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ বা নিন্দাবাদ কথনও সর্ব্বোচ্চ ভাব হতে পারে না। ডেভিডের হস্ত শোনিতে কলুষিত ছিল, সেই জন্য তিনি মন্দিরনির্ম্মাণ করতে পারেন নি।

আমাদের হৃদয়ে প্রেম, ধর্ম্ম ও পবিত্রতার ভাব যতই বাড়তে থাকে, ততই আমরা বাইরে প্রেম, ধর্ম্ম ও পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা অপরের কার্য্যের যে নিন্দাবাদ করি, তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদেরই নিন্দা। তুমি তোমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটাকে ঠিক কর—যা তোমার হাতের ভিতর রয়েছে—তা হলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও তোমার পক্ষে আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে। এ যেন জলস্থিতিবিজ্ঞানের

(Hydrostatics) সমস্যার মত—এক বিন্দু জলের শক্তিতে সমগ্র জগৎকে সাম্যাবস্থায় রাখা যেতে পারে। আমাদের ভিতরে যা নেই, বাইরেও তা দেখতে পারি না। বৃহৎ ইঞ্জিনের পক্ষে তৎসদৃশ অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিন যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমরাও তদ্রূপ। ক্ষুদ্র ইঞ্জিনটির ভিতর কোন গোলমাল দেখে আমরা বৃহৎ ইঞ্জিনটাতেও কোন গোল হয়েছে, এরূপ কল্পনা করে থাকি।

জগতে যথার্থ যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। নিন্দাবাদে কোনই ফল হয় না।

যথার্থ বৈদান্তিককে সকলের সহিত সহানুভূতি করতে হবে। কারণ, অদ্বৈতবাদ, বা সম্পূর্ণ একত্বভাবই বেদান্তের সার মর্ম্ম। দ্বৈতবাদীরা সাধারণতঃ গোঁড়া হয়ে থাকে—তারা মনে করে, তাদের পথই একমাত্র পথ। ভারতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, আর তারা অত্যন্ত গোঁড়া। শৈবেরা আর একটি দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়; তাদের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত আছে। সে শিবের এমন গোঁড়া ভক্ত ছিল যে, অপর কোন দেবতার নাম কানে শুনবে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে দু'কানে দুই ঘণ্টা বেঁধে রাখত। শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, শিব ও বিষ্ণুতে যে কোন প্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেব। সেইজন্য তিনি তার কাছে অর্দ্ধ শিব, অর্দ্ধ বিষ্ণু অর্থাৎ হরিহরমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হলেন। সেই সময় ঘণ্টাকর্ণ তাঁকে আরতি করছিল। কিন্তু তার এমন গোঁড়ামী যে, যখন সে দেখলে, ধূপ-ধূনার

গন্ধ বিষ্ণুর নাকে যাচ্ছে, তখন বিষ্ণু যাতে সেই সুগন্ধ উপভোগ করতে না পান, তজ্জন্য তাঁর নাক চেপে ধরলে !

* * *

মাংসাশী প্রাণী, যেমন সিংহ, এক আঘাত করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহিষ্ণু বলদ সারাদিন চলেছে, চলতে চলতেই সে খেয়ে ও ঘুমিয়ে নিচ্ছে। চঞ্চল, সদাক্রিয়াশীল 'ইয়াঙ্কী' (মার্কিন) ভাতখেকো চীনা কুলির সঙ্গে পেরে ওঠে না। যতদিন ক্ষত্রশক্তির প্রাধান্য থাকবে, ততদিন মাংসভোজন প্রচলিত থাকবে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমে যাবে, তখন নিরামিষাশীর দল প্রবল হবে।

* * *

যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি, তখন যেন আমরা নিজেকে দুভাগ করে ফেলি—আমিই আমার অন্তরাত্মাকে ভালবাসি। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমিও ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমরা ঈশ্বরকে আমাদের অনুরূপ করে সৃষ্টি করে থাকি। আমরাই ঈশ্বরকে আমাদের প্রভু হবার জন্য সৃষ্টি করে থাকি, ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁর দাস করেন না। যখন আমরা জানতে পারি, আমরা ঈশ্বরের সহিত এক, ঈশ্বর আমাদের সখা, তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা লাভ হয়, তখনই আমাদের মুক্তি হয়। সেই অনন্ত পুরুষ থেকে যতদিন তুমি আপনাকে এক চুলও তফাৎ করবে, ততদিন ভয় কখন দূর হতে পারে না।

ভগবৎ-সাধনা করে—ভগবানকে ভালবেসে জগতের কি কল্যাণ হবে, আহাম্মকের মত এই প্রশ্ন কখন করো না। চুলোয় যাক জগৎ,

ভগবানকে ভালবাস—আর কিছু চেয়ো না। ভালবাস এবং অপর কিছু প্রত্যাশা করো না। ভালবাস—আর সব মত-মতান্তর ভুলে যাও। প্রেমের পেয়ালা পান করে পাগল হয়ে যাও। বল, 'হে প্রভু, আমি তোমারই—চিরকালের জন্য তোমারই' এবং আর সব ভুলে গিয়ে ঝাঁপ দাও। ঈশ্বর বলতে যে প্রেম ছাড়া আর কিছু বুঝায় না। একটা বিড়াল তার বাচ্চাদের ভালবেসে আদর করছে দেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে যাও, আর ভগবানের উপাসনা কর। সে স্থানে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এ কথা বিশ্বাস কর। সর্ব্বদা বল, 'আমি তোমার, আমি তোমার'; কারণ, আমরা সর্ব্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারি। তাঁকে কোথাও খুঁজে বেড়িও না—তিনি ত প্রত্যক্ষ রয়েছেন, তাঁকে শুধু দেখে যাও। "সেই বিশ্বাত্মা, জগজ্জ্যোতিঃ প্রভু সর্ব্বদা তোমাদের রক্ষা করুন।"

* * *

নির্গুণ পরব্রহ্মকে উপাসনা করা যেতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে আমাদেরই মত প্রকৃতিসম্পন্ন তাঁর প্রকাশবিশেষকে উপাসনা করতেই হবে। যীশু আমাদের মত মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন—তিনি খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর মত খ্রীষ্ট হতে পারি, আর আমাদিগকে তা হতেই হবে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ অবস্থাবিশেষের নাম—যা আমাদের লাভ করতে হবে। যীশু ও গৌতমের মধ্যে সেই সেই অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল। জগন্মাতা বা আদ্যাশক্তিই ব্রহ্মের প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—তার পর খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তাঁ থেকে প্রকাশ হয়েছেন। আমরাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা গঠন করে নিজেদের বদ্ধ করি, আবার আমরাই ঐ শিকল ছিঁড়ে মুক্ত হই। আত্মা অভয়স্বরূপ।

আমরা যখন আমাদের আত্মার বহির্দ্দেশে অবস্থিত ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন ভালই করে থাকি, তবে আমরা যে কি করছি, তা জানি না। আমরা যখন আত্মার স্বরূপ জানতে পারি, তখনই ঐ রহস্য বুঝি। একত্বই প্রেমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

পারসিক সুফিদিগের কবিতায় আছে,—

"একদিন এমন ছিল, যখন আমি নারী ও তিনি পুরুষ ছিলেন। উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বাড়তে লাগল—শেষে তিনি বা আমি কেউই রইলাম না। এখন এইটুকু মাত্র অস্পষ্টভাবে স্মরণ হয় যে, একসময়ে দুজন পৃথক লোক ছিল; শেষে প্রেম এসে উভয়কে এক করে দিলে।"*

জ্ঞান অনাদি অনন্তকাল বর্ত্তমান—ঈশ্বর যতদিন আছেন, জ্ঞানও ততদিন আছে। যে ব্যক্তি কোন আধ্যাত্মিক নিয়ম আবিষ্কার করেন, তাঁকেই inspired বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ বা ঋষি বলে; তিনি যা প্রকাশ করেন, তাকে revelation বা অপৌরুষেয় বাক্য বলে। কিন্তু এরূপ অপৌরুষেয় বাক্যও অনন্ত—এমন নয় যে এ পর্য্যন্ত যা হয়েছে তাতেই তা শেষ হয়ে গেছে, এমন অন্ধভাবে তার অনুসরণ করতে হবে। হিন্দুদের বিজেতারা তাদের এত দিন ধরে সমালোচনা করে এসেছে যে, এখন তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্ম্ম সমালোচনা করতে সাহস করে, আর তাইতে তাদের স্বাধীনচেতা করে দিয়েছে। তাদের বৈদেশিক শাসনকর্ত্তারা অজ্ঞাতসারে তাদের পায়ের বেড়ী ভেঙ্গে

---

* শ্রীচৈতন্যের সহিত রায় রামানন্দের কথোপকথনেও এই ভাবের কথা আছে—

না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জানি॥ ইত্যাদি —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

দিয়েছে। হিন্দুরা জগতের মধ্যে সব চেয়ে ধার্ম্মিক জাতি হয়েও বাস্তবিকই ভগবন্নিন্দা বা ধর্ম্মনিন্দা কাকে বলে, তা জানে না। তাদের মতে ভগবান বা ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কোন ভাবে আলোচনা করা হউক না, তাতেই পবিত্রতা ও কল্যাণলাভ হয়ে থাকে। আর তারা অবতার বা শাস্ত্র বা ধর্ম্মধ্বজিতার প্রতি কোন প্রকার কৃত্রিম শ্রদ্ধা বা ভক্তি দেখায় না।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় খ্রীষ্টকে তাদের নিজের মতানুযায়ী করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনাদর্শে নিজেদের গড়বার চেষ্টা করে নি। এইজন্যই খ্রীষ্ট-সম্বন্ধে যে-সকল গ্রন্থ উক্ত সম্প্রদায়ের সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার সহায় হয়েছিল, কেবল সেইগুলিকেই রাখা হয়েছিল। সুতরাং সেই গ্রন্থগুলির উপর কখনই নির্ভর করা যেতে পারে না। আর এইরূপ গ্রন্থ বা শাস্ত্রোপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা—ওতে আমাদের হাত পা একেবারে বেঁধে রেখে দেয়। এদের মতে কি বিজ্ঞান, কি ধর্ম্ম, কি দর্শন—সকলকেই ঐ শাস্ত্রের মতানুযায়ী হতে হবে। প্রটেষ্টাণ্টদের এই বাইবেলের অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক অত্যাচার। খ্রীষ্টীয়ান দেশসমূহে প্রত্যেকের মাথার উপর এক একটা প্রকাণ্ড গীর্জ্জা চাপান রয়েছে, আর তার উপরে একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ, কিন্তু তবুও মানুষ বেঁচে রয়েছে, আর তার উন্নতিও হচ্ছে। এতেই কি প্রমাণিত হচ্ছে না যে, মানুষ ঈশ্বরস্বরূপ?

জীবের মধ্যে মানুষই সর্ব্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্ব্বোচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় বলে ধারণা করতে পারি না; সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মানবভাবাপন্ন—আবার মানবও ঈশ্বরস্বরূপ। যখন আমরা মনুষ্যভাবের উপরে উঠে তার অতীত কোন উচ্চ বস্তুর

সাক্ষাৎকার করি, তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ মন কল্পনা—এ সবেরই বাইরে লাফ দিতে হয়। আমরা যখন উচ্চাবস্থা লাভ করে সেই অনন্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ জানবার সম্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের সর্ব্বোচ্চ সীমা। পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পারি, তা কেবল সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান। আমরা নিজেরা যা কিছু করে থাকি অথবা অনুভব করি, তাই দিয়ে আমরা তাদের বিচার করে থাকি।

সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্ব্বদাই সমান—কেবল সেটা কখন বেশী, কখন কম অভিব্যক্ত হয়, এই মাত্র। ঐ জ্ঞানের একমাত্র প্রস্রবণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই ঐ জ্ঞানলাভ করা যায়।

*　　*　　*

সমুদয় কাব্য, চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত কেবল ভাষার, বর্ণের ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

*　　*　　*

ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফলভোগ করে—তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আসে, তাদের মহা দুর্দ্দৈব—তাদের বেশী বেশী ভুগতে হবে।

যারা সমত্বভাব লাভ করেছে, তারাই ব্রহ্মে অবস্থিত বলে কথিত হয়ে থাকে। সকল রকম ঘৃণার অর্থ—আত্মার দ্বারা আত্মার বিনাশ। সুতরাং প্রেমই জীবনের যথার্থ নিয়ামক। প্রেমের অবস্থালাভ করাই সিদ্ধাবস্থা; কিন্তু আমরা যতই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা কম কাজ (তথাকথিত) করতে পারি। সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা জানে

ও দেখে যে, সবই ছেলেখেলা মাত্র, সুতরাং তারা কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এক ঘা দিয়ে দেওয়া সোজা কাজ, কিন্তু হাত গুটিয়ে স্থির হয়ে থেকে 'হে প্রভু, আমি তোমারই শরণাগত হলাম' বলা এবং তিনি যা হয় করুন বলে অপেক্ষা করে থাকা ভয়ানক কঠিন।

৫ই জুলাই, শুক্রবার

যতক্ষণ তুমি সত্যের অনুরোধে যে কোন মুহূর্তে বদলাতে প্রস্তুত না হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কখনই সত্যলাভ করতে পারবে না; অবশ্য তোমাকে দৃঢ়ভাবে সত্যের অনুসন্ধানে লেগে থাকতে হবে।

* * *

চার্ব্বাকেরা ভারতের একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়—তারা সম্পূর্ণ জড়বাদী ছিল। এখন সে সম্প্রদায় লুপ্ত হয়ে গেছে, আর তাদের অধিকাংশ গ্রন্থও লোপ পেয়ে গেছে। তাদের মতে আত্মা দেহ ও ভৌতিক শক্তি থেকে উৎপন্ন—সুতরাং দেহের নাশে আত্মারও নাশ, এবং দেহনাশের পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তার কোনও প্রমাণ নেই। তারা কেবল ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্বীকার করত—অনুমান দ্বারাও যে জ্ঞানলাভ হতে পারে তা স্বীকার করত না।

* * *

সমাধি-অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদভাব, অথবা সমত্বভাব লাভ করা।

* * *

জড়বাদী বলেন, আমি মুক্ত বলে আমাদের যে জ্ঞান হয়, সেটা ভ্রমমাত্র। বিজ্ঞানবাদী বলেন, আমি বদ্ধ বলে যে জ্ঞান হয়, সেইটেই

ভ্রমমাত্র। বেদান্তবাদী বলেন, তুমি মুক্ত ও বদ্ধ দুই-ই। ব্যবহারিক ভূমিতে তুমি কখনই মুক্ত নও, কিন্তু পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে তুমি নিত্যমুক্ত।

মুক্তি ও বন্ধন উভয়েরই পারে চলে যাও।

আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে; জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করলেই ঐ শক্তি তোমাতে আসবে।

"হে মাতঃ বাগীশ্বরি, তুমি স্বয়ম্ভূ, তুমি আমার জিহ্বায় বাক্-রূপে আবির্ভূতা হও!

"হে মাতঃ, বজ্র তোমার বাণীস্বরূপ—তুমি আমার ভিতর আবির্ভূতা হও! হে কালি, তুমি অনন্ত কালরূপিণী, তুমিই অমোঘ শক্তিস্বরূপিণী!"

৬ই জুলাই, শনিবার

(অদ্য স্বামীজি ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন।)

শঙ্করের মতে জগৎকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—অস্মদ্ (আমি) ও যুষ্মদ্ (তুমি)। আর আলো ও অন্ধকার যেমন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বস্তু, ঐ দুইটিও তদ্রূপ; সুতরাং বলা বাহুল্য, এ দুয়ের কোনটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হতে পারে না। এই আমি বা বিষয়ীর উপর তুমি বা বিষয়ের অধ্যাস হয়েছে। বিষয়ীই একমাত্র সত্য বস্তু, অপরটি অর্থাৎ বিষয় আপাতপ্রতীয়মান সত্তামাত্র। ইহার বিরুদ্ধ মত, অর্থাৎ বিষয় সত্য ও বিষয়ী মিথ্যা—এ মত কখন প্রমাণ করা যেতে পারে না। জড়পদার্থ ও বহির্জ্জগৎ আত্মারই অবস্থাবিশেষ-মাত্র। প্রকৃতপক্ষে একটি সত্তাই রয়েছে।

আমাদের অনুভূত এই জগৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণে উৎপন্ন। যেমন বল-সমান্তরিকে * দুই বিভিন্নমুখী বলপ্রয়োগের ফলে একটি বস্তুতে কর্ণাভিমুখী গতির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ এই সংসারও আমাদের উপর প্রযুক্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ফলস্বরূপ। এই জগৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ ও সত্য; কিন্তু আমরা জগৎকে সে ভাবে দেখছি না; যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, তেমনি আমাদেরও ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম হয়েছে। একেই বলে অধ্যাস। যেমন পূর্ব্বে আমরা একটি দৃশ্য দেখেছি, এখন সেইটে স্মরণ হল। যে সত্তা একটা সত্য বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তাকেই অধ্যস্ত সত্তা বলে। সেই সময়ের জন্য সেটা সত্য বলে বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অথবা অধ্যাসের দৃষ্টান্ত অপরে এইরূপ দেন—উষ্ণতা জলের ধর্ম্ম নয়, অথচ যেমন আমরা জল উষ্ণ বলে কল্পনা করে থাকি। সুতরাং অধ্যাস মানে 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'—যে বস্তু যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি করা। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা যখন জগৎ দেখছি, তখন আমরা সত্যকেই দর্শন করছি, কিন্তু মাঝখানে একটা আবরণ পড়েছে—তারই দ্বারা বিকৃত-ভাবাপন্ন করে দেখছি।

তুমি নিজেকে বাইরে প্রক্ষেপ না করে কখন নিজেকে জানতে পার না। ভ্রান্তি-অবস্থায় আমাদের সামনের বস্তুগুলোকেই আমরা সত্য বলে মনে করি, অদৃষ্ট বস্তুকে কখন সত্য বলে আমাদের বোধ হয় না। এইরূপে আমরা বিষয়কে বিষয়ী বলে ভুল করে থাকি।

---

* Parallelogram of forces—একটি সামন্তরিক ক্ষেত্রের সংলগ্ন বাহুদ্বয় যদি দুইটি বলের তীব্রতা ও গতিরেখার সূচনা করে, তাহা হইলে উহার কর্ণ দ্বারা ঐ দুইটি বলের সমবায়জনিত ফলের তীব্রতা ও গতিরেখা নিরূপিত হইবে।

আত্মা কিন্তু কখন বিষয় হন না। মন হচ্ছে অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়, আর বহিরিন্দ্রিয়গুলি তারই হাতের যন্ত্রস্বরূপ। বিষয়ীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বহিঃপ্রক্ষেপশক্তি (objectifying power) আছে—তাইতে তিনি 'আমি আছি' বলে আপনাকে জানতে পারেন। কিন্তু সেই আত্মা বা বিষয়ী নিজেরই বিষয়, মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নন। তবে আমরা একটা ভাবকে (idea) আর একটা ভাবের উপর অধ্যাস করতে পারি—যেমন আমরা যখন বলি 'আকাশ নীল'—আকাশটা একটা ভাবমাত্র, আর নীলত্বও একটা ভাব—আমরা নীলত্ব-ভাবটা আকাশের উপর আরোপ বা অধ্যাস করে থাকি।

বিদ্যা ও অবিদ্যা বা জ্ঞান ও অজ্ঞান—এই দুই নিয়ে জগৎ, কিন্তু আত্মা কোন কালে অবিদ্যাচ্ছন্ন হন না। আপেক্ষিক জ্ঞানও ভাল, কারণ সেটা সেই চরম জ্ঞানে আরোহণের সোপান। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান, এমন কি, বেদপ্রমাণজন্য জ্ঞানও কখন পরমার্থ সত্য হতে পারে না; কারণ ঐগুলি সবই আপেক্ষিক জ্ঞানের সীমার ভিতর। প্রথমে 'আমি দেহ' এই ভ্রম দূর করে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হবে। মানবীয় জ্ঞান পশুজ্ঞানেরই উচ্চতর অবস্থামাত্র।

* * *

বেদের এক অংশে কর্ম্মকাণ্ড—নানাবিধ অনুষ্ঠানপদ্ধতি, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির উপদেশ আছে। অপরাংশে ব্রহ্মজ্ঞান ও যথার্থ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বিষয় বর্ণিত আছে। বেদের এই ভাগ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দেন, আর সেই জন্যই বেদের ঐ ভাগের জ্ঞান যথার্থ পারমার্থিক জ্ঞানের অতি সমীপবর্ত্তী। সেই অনন্ত পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্ঞান কোন

শাস্ত্রের উপর বা অপর কিছুর উপর নির্ভর করে না; এই জ্ঞান স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ। বহু শাস্ত্রপাঠেও এই জ্ঞান লাভ হয় না; এ কোন মতবিশেষ নয়, এ জ্ঞান অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ। আর্শির উপর যে ময়লা রয়েছে, তা পরিষ্কার করে ফেল। নিজের মনটাকে পবিত্র কর, তা হলেই দপ্ করে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি ব্রহ্ম।

শুধু ব্রহ্মই আছেন—জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, নরহত্যা নেই, কোনরূপ পরিণাম নেই, ভালও নেই, মন্দও নেই, সবই আমরা রজ্জুতে সর্পভ্রম করছি—ভ্রম আমাদেরই। আমরা তখনই কেবল জগতের কল্যাণ করতে পারি, যখন আমরা ভগবানকে ভালবাসি এবং তিনিও আমাদের ভালবাসেন। হত্যাকারী ব্যক্তিও ব্রহ্মস্বরূপ—তার উপর হত্যাকারিরূপ যে আবরণ রয়েছে, সেটা তাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হয়েছে মাত্র। তাকে আস্তে আস্তে হাত ধরে এই সত্য জানিয়ে দাও।

আত্মাতে কোন জাতিভেদ নেই; 'আছে' ভাবাটাই ভ্রম। সেই রকম 'আত্মার জীবন বা মরণ বা কোন প্রকার গতি বা গুণ আছে' ভাবাও ভ্রম। আত্মার কখনও পরিণাম হয় না, আত্মা কখনও যানও না, আসেনও না। তিনি তাঁর নিজের সমুদয় প্রকাশগুলির অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ, কিন্তু আমরা তাঁকে ঐ ঐ প্রকাশ বলে মনে করছি। এ এক অনাদি অনন্ত ভ্রম চিরকাল ধরে চলেছে। তবে বেদকে আমাদের ভূমিতে নেমে এসে আমাদের উপদেশ দিতে হচ্ছে, কারণ, বেদ যদি উচ্চতম সত্যকে উচ্চতম ভাবে বা ভাষায় আমাদের কাছে বলতেন, তা হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না।

স্বর্গ আমাদের বাসনাসৃষ্ট কুসংস্কার-মাত্র, আর বাসনা চিরকালই

বন্ধন—অবনতির দ্বারস্বরূপ। ব্রহ্মদৃষ্টি ছাড়া আর কোন ভাবে কোন বস্তুকে দেখো না। তা যদি কর, তা হলে অন্যায় বা মন্দ দেখবে; কারণ আমরা যে বস্তু দেখতে পাই, তার উপর একটা ভ্রমাত্মক আবরণ প্রক্ষেপ করি, তাই মন্দ দেখতে পাই। এই সব ভ্রম হতে মুক্ত হও এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। সব রকম ভ্রমমুক্ত হওয়াই মুক্তি।

এক হিসাবে সকল মানুষই ব্রহ্মকে জানে; কারণ সে জানে, "আমি আছি"; কিন্তু মানুষ নিজের যথার্থ স্বরূপ জানে না। আমরা সকলেই জানি যে আমরা আছি, কিন্তু কি করে আছি তা জানি না। অদ্বৈতবাদ ছাড়া জগতের অন্যান্য নিম্নতর ব্যাখ্যা আংশিক সত্যমাত্র। কিন্তু বেদের তত্ত্ব এই যে, আমাদের প্রত্যেকের ভিতর যে আত্মা রয়েছে, তা ব্রহ্মস্বরূপ। জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে যা কিছু সব—জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় দ্বারা সীমাবদ্ধ। আমাদের অপরোক্ষানুভূতি বেদেরও অতীত; কারণ বেদেরও প্রামাণ্য ঐ অপরোক্ষানুভূতির উপর নির্ভর করে। সর্ব্বোচ্চ বেদান্ত হচ্ছে প্রপঞ্চাতীত সত্তার তত্ত্বজ্ঞান।

সৃষ্টির আদি আছে বললে সর্ব্বপ্রকার দার্শনিক বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

জগৎপ্রপঞ্চান্তর্গত অব্যক্ত ও ব্যক্ত শক্তিকে মায়া বলে। যতক্ষণ সেই মাতৃস্বরূপিণী মহামায়া আমাদের ছেড়ে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা মুক্ত হতে পারি না।

জগৎটা আমাদের সম্ভোগের জন্য পড়ে রয়েছে; কিন্তু কখন কিছুর অভাববোধ করো না। অভাববোধ করাটা দুর্ব্বলতা, অভাব-

বোধই আমাদের ভিক্ষুক করে ফেলে। কিন্তু আমরা কি ভিক্ষুক? আমরা রাজপুত্র!

৭ই জুলাই, রবিবার, প্রাতঃকাল

অনন্ত জগৎপ্রপঞ্চকে যতই ভাগ করা যাক না কেন, তা অনন্তই থাকে, আর তার প্রত্যেক ভাগটাও অনন্ত।

পরিণামী ও অপরিণামী, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—উভয় অবস্থাতেই ব্রহ্ম এক। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক বলে জেনো। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই ত্রিপুটী জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। যোগী ধ্যানে যে ঈশ্বরের দর্শন করেন, তা তিনি নিজ আত্মার শক্তিতেই দেখে থাকেন।

আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র। যতদিন ভোগসুখ খোঁজা যায়, ততদিন বন্ধন থেকে যায়। যতক্ষণ অপূর্ণ থাকা যায়, ততক্ষণই ভোগ সম্ভব; কারণ ভোগের অর্থ অপূর্ণ বাসনার পরিপূর্ত্তি। জীবাত্মা প্রকৃতিকে সম্ভোগ করে থাকে। প্রকৃতি, জীবাত্মা ও ঈশ্বর—এদের অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছেন ব্রহ্ম। কিন্তু যতদিন আমরা তাঁকে প্রকাশ না কচ্ছি ততদিন তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। যেমন ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করতে পারা যায়, তেমনি ব্রহ্মকেও মন্থনের দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যায়। দেহটাকে নিম্ন অরণি, প্রণব বা ওঙ্কারকে উত্তরারণি বলে কল্পনা কর, আর ধ্যান যেন মন্থনস্বরূপ।* তা হলে আত্মার মধ্যে যে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অগ্নি আছে, তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তপস্যা দ্বারা এইটে

---

* আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ।—ব্রহ্মোপনিষৎ

করতে চেষ্টা কর। দেহকে সরলভাবে রেখে ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে আহুতি দাও। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রগুলি সব ভিতরে, তাদের যন্ত্র বা গোলকগুলি কেবল বাহিরে। সুতরাং তাদের জোর করে মনে প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর ধারণার সহায়ে মনকে ধ্যানে স্থির কর। যেমন দুধের ভিতর সর্ব্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্ব্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।†

সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়া একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।

* * *

জগৎটা একটা অবিরাম গতিস্বরূপ, আর ঘর্ষণ (friction) হতেই কালে সমুদয়ের নাশ হবে; তারপর দিন কতক বিশ্রাম হয়ে আবার সব আরম্ভ হবে।

যতদিন এই 'ত্বগম্বর' মানুষকে বেষ্টন করে থাকে, অর্থাৎ যতদিন সে আপনাকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন ভাবছে, ততদিন সে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না।

রবিবার, অপরাহ্ণ

ভারতে ছটি দর্শনকে আস্তিকদর্শন বলে; কারণ তারা বেদে বিশ্বাসী।

---

† ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি চ বিজ্ঞানম্
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন। —ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ, ২০

ব্যাসের দর্শন বিশেষভাবে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সূত্রাকারে অর্থাৎ যেমন বীজগণিতশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা অক্ষরের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ করা হয়, তেমনি ভাবে এটা লিখেছিলেন—এতে কর্তা ক্রিয়া বড় একটা নেই। ব্যাসসূত্র এইরূপ সংক্ষেপে রচিত হওয়ায়, শেষে তার অর্থ বুঝতে এত গোল হল যে ঐ এক সূত্র থেকেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদ এবং অদ্বৈতবাদ বা 'বেদান্ত-কেশরী'র উৎপত্তি হল। আর এই সব বিভিন্ন মতের বড় বড় ভাষ্যকারেরা বেদের অক্ষররাশিকে তাঁদের দর্শনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য সময়ে সময়ে জেনেশুনে মিথ্যাবাদী হয়েছেন।

উপনিষদে কোন ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যকলাপের ইতিহাস অতি অল্পই পাওয়া যায়; কিন্তু অন্যান্য প্রায় সকল শাস্ত্রই প্রধানতঃ কোন ব্যক্তিবিশেষেব ইতিহাস।

বেদে প্রায় শুধু দার্শনিক তত্ত্বেরই আলোচনা আছে। দর্শনবর্জ্জিত ধর্ম্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্ম্মবর্জ্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মানে অদ্বৈতবাদ, কিন্তু বিশেষযুক্ত। তার ব্যাখ্যাতা রামানুজ। তিনি বলেন, "বেদরূপ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করে ব্যাস মানবজাতির কল্যাণের জন্য এই বেদান্তদর্শনরূপ মাখন তুলেছেন।" তিনি আরও বলেছেন, "জগৎপ্রভু ব্রহ্ম অশেষকল্যাণ-গুণ-সমন্বিত পুরুষোত্তম।" মধ্ব পুরো-দস্তুর দ্বৈতবাদী। তিনি বলেন, স্ত্রীলোকের পর্য্যন্ত বেদপাঠে অধিকার আছে। তিনি প্রধানতঃ পুরাণ থেকে তাঁর মতস্থাপনের জন্য শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম মানে বিষ্ণু—শিব নন; কারণ বিষ্ণু ভিন্ন মুক্তিদাতা আর কেউ নেই।

৮ই জুলাই, সোমবার

মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যার ভিতর বিচারের স্থান নেই—তিনি শাস্ত্রপ্রমাণেই সব গ্রহণ করেছেন।

রামানুজ বলেন, বেদই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র পঠনীয় গ্রন্থ। ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উচ্চবর্ণের সন্তানদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর অষ্টম, দশম বা একাদশ বর্ষ বয়সে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করা উচিত। বেদাধ্যয়নের অর্থ গুরুগৃহে গিয়ে নিয়মিত স্বর ও উচ্চারণের সহিত বেদের শব্দরাশি আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করা।

জপের অর্থ ভগবানের পবিত্র নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ; এই জপ করতে করতে সাধক ক্রমে ক্রমে সেই অনন্তরূপে উপনীত হন। যাগযজ্ঞাদি যেন অদৃঢ় নৌকা বা ভেলাস্বরূপ। ব্রহ্মকে জানতে হলে ঐ যাগযজ্ঞাদি ছাড়া আরও কিছু চাই। আর ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। মুক্তি আর কিছু নয়—অজ্ঞানের বিনাশ; ব্রহ্মজ্ঞানেই এই অজ্ঞানের বিনাশ হয়। বেদান্তের তাৎপর্য্য জানতে গেলে যে এই সব যাগযজ্ঞ করতে হবে, তার কোন মানে নেই; কেবল ওঙ্কারজপ করলেই যথেষ্ট।

ভেদদর্শনই সমুদয় দুঃখের কারণ, আর অজ্ঞানই এই ভেদদর্শনের কারণ। এই কারণেই যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তাতে আরও ভেদজ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। ঐ সকল যাগযজ্ঞাদির উদ্দেশ্য কিছু (ভোগসুখ) লাভ করা—অথবা কোন কিছু (দুঃখ) থেকে নিস্তার পাওয়া।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, আত্মাই ব্রহ্ম, এবং আমরাই সেই আত্মস্বরূপ—এই প্রকার জ্ঞানের দ্বারাই সকল ভ্রান্তি দূর হয়। এই তত্ত্ব প্রথম শুনতে হবে, পরে মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারা ধারণা করতে হবে, অবশেষে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হবে। মনন অর্থে বিচার করা—বিচার দ্বারা, যুক্তিতর্কের

দ্বারা ঐ জ্ঞান নিজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত করা। প্রত্যক্ষানুভূতি ও সাক্ষাৎকার অর্থে সর্ব্বদা চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা তাঁকে আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত করে ফেলা। এই অবিরাম চিন্তা বা ধ্যান যেন একপাত্র হতে অপর পাত্রে প্রক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। ধ্যান দিবারাত্র মনকে ঐ ভাবের মধ্যে রেখে দেয় এবং তাইতে আমাদের মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে। সর্ব্বদা 'সোঽহং' 'সোঽহং' এই চিন্তা কর—এইরূপ অহরহ চিন্তা মুক্তির প্রায় কাছাকাছি। দিবারাত্র বল—'সোঽহং' 'সোঽহং'। এইরূপ সর্ব্বদা চিন্তার ফলে অপরোক্ষানুভূতিলাভ হবে। ভগবানকে এইরূপ তন্ময়ভাবে সদাসর্ব্বদা স্মরণের নামই ভক্তি।

সব রকম শুভকর্ম্ম এই ভক্তিলাভ করতে গৌণভাবে সাহায্য করে থাকে। শুভ চিন্তা ও শুভ কার্য্য অশুভ চিন্তা ও অশুভ কর্ম্ম অপেক্ষা কম ভেদজ্ঞান উৎপাদন করে, সুতরাং গৌণভাবে এরা মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ কর। কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণতা বা সিদ্ধাবস্থালাভ হয়। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সত্যস্বরূপ ভগবানের সাধনা করেন, তাঁর কাছে সেই সত্যস্বরূপ ভগবান প্রকাশিত হন।

* * *

আমরা যেন প্রদীপস্বরূপ, আর ঐ প্রদীপের জ্বলাটাই হচ্ছে আমরা যাকে 'জীবন' বলি। যখনই অম্লজান ফুরিয়ে যাবে, তখনই আলোটাও নিবে যাবে। আমরা কেবল প্রদীপটাকে সাফ রাখতে পারি। জীবনটা কতকগুলি জিনিসের মিশ্রণস্বরূপ, এটা একটা কার্য্যস্বরূপ, সুতরাং উহা অবশ্যই ওর উপাদান-কারণগুলিতে লয় হবে।

৯ই জুলাই, মঙ্গলবার

আত্মা হিসাবে মানুষ বাস্তবিকই মুক্ত, কিন্তু মানুষ হিসাবে সে বদ্ধ,

প্রত্যেক ভৌতিক অবস্থাদ্বারা সে পরিণাম পাচ্ছে। মানুষ হিসাবে তাকে একটা যন্ত্রবিশেষ বলা যায়, শুধু তার ভিতর একটা মুক্তি বা স্বাধীনতার ভাব আছে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু জগতের সব শরীরের মধ্যে এই মনুষ্যশরীরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শরীর, আর মনুষ্যমনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন। যখন মানব আত্মোপলব্ধি করে, তখন সে আবশ্যকমত যে কোন শরীর ধারণ করতে পারে; তখন সে সব নিয়মের পার। এটা প্রথমতঃ একটা উক্তিমাত্র; একে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্য্যে এটা নিজে নিজে প্রমাণ করে দেখতে হবে; আমরা নিজের মনকে বুঝাতে পারি, কিন্তু অপরের মনকে বুঝাতে পারি না। ধর্ম্মবিজ্ঞানের মধ্যে একমাত্র রাজযোগই প্রমাণ করা যেতে পারে, আর আমি যা নিজে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে ঠিক বলে জেনেছি, তাই শুধু শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিচার-শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই অপরোক্ষ জ্ঞান, কিন্তু তা কখন যুক্তিবিরোধী হতে পারে না।

কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, সুতরাং কর্ম্ম বিদ্যা বা জ্ঞানের সহায়ক। বৌদ্ধদের মতে মানব ও তির্য্যগ্‌জাতির হিতসাধনই একমাত্র কর্ম্ম; ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদের মতে উপাসনা ও সর্ব্বপ্রকার যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানও ঠিক সেইরূপই কর্ম্ম এবং চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। শঙ্করের মতে, "শুভাশুভ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।" যে-সকল কার্য্য অজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো পাপ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়, কিন্তু কারণস্বরূপে—যেহেতু তাদের দ্বারা রজঃ ও তমঃ বেড়ে যায়। সত্ত্বের দ্বারাই কেবল জ্ঞানলাভ হয়। পুণ্য ও শুভকর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের আবরণ দূর হয়, আর কেবল জ্ঞানের দ্বারাই ঈশ্বরদর্শন হয়।

জ্ঞান কখন উৎপাদন করা যেতে পারে না, তাকে কেবল আবিষ্কার করা যেতে পারে; আর যে কোন ব্যক্তি কোন বড় আবিষ্ক্রিয়া করেন,

তাঁকেই প্রত্যাদিষ্ট (inspired) পুরুষ বলা যেতে পারে। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁকে ঋষি বা অবতার বলি; আর যখন সেটা কোন জড়জগতের সত্য হয়, তখন তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলি। আর যদিও সকল সত্যের মূল সেই এক ব্রহ্মই, তথাপি আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীকে উচ্চতর আসন দিয়ে থাকি।

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সার, তার ভিত্তিস্বরূপ; আর জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়রূপ যে অভিব্যক্তি, তা ব্রহ্মেতে কাল্পনিক ভেদমাত্র। রামানুজ ব্রহ্মে জ্ঞানেব অস্তিত্ব স্বীকার করেন। খাঁটি অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মে কোন গুণই স্বীকার কবেন না—এমন কি সত্তা পর্য্যন্ত নয়—সত্তা বলতে আমরা যাই কেন বুঝি না। রামানুজ বলেন, আমরা সচরাচর যাকে জ্ঞান বলি, ব্রহ্ম তারই সারস্বরূপ। অব্যক্ত বা সাম্যভাবাপন্ন জ্ঞান ব্যক্ত বা বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হলেই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি।

* * *

জগতের উচ্চতম দার্শনিক ধর্ম্মসমূহেব মধ্যে অন্যতম—বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের আপামর সাধারণ সকলের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল। ভেবে দেখ দেখি, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদের সভ্যতা ও শিক্ষা কি অদ্ভুত ছিল, যাতে তারা ঐরূপ উচ্চ উচ্চ ভাবের ধারণা করতে পেরেছিল!

ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই জাতিভেদ স্বীকার করেন নি, আর এখন ভারতে একজনও বৌদ্ধ দেখতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য দার্শনিকেরা সকলেই অল্পবিস্তর সামাজিক কুসংস্কারগুলোর ধামাধরা ছিলেন; তাঁরা যতই উঁচুতে উঠে থাকুন না কেন, তাঁদের মধ্যে একটু-আধটু চিল-শকুনির ভাব ছিলই। গুরু মহারাজ যেমন

বলতেন, "চিল-শকুনি এত উঁচুতে ওঠে যে, তাদের দেখা যায় না, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে, কোথায় এক টুকরা পচা মাংস পড়ে আছে !"

* * *

প্রাচীন হিন্দুরা অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন—যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁরা বলতেন—

পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।

কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥ —চাণক্যনীতি

অর্থাৎ, বিদ্যা যদি পুঁথিগত হয়, আর ধন যদি পরের হাতে থাকে, কার্য্যকাল উপস্থিত হলে সে বিদ্যাও বিদ্যা নয়, সে ধনও ধন নয়।

শঙ্করকে অনেকে শিবের অবতার বলে জ্ঞান করে থাকে।

১০ই জুলাই, বুধবার

ভারতে সাড়ে ছ কোটি মুসলমান আছে—তাদের মধ্যে কতক সুফী আছে। এই সুফীরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে। আর তাদের দ্বারাই ঐ ভাব ইউরোপে এসেছে। তারা বলে, 'আনল হক্' অর্থাৎ আমিই সেই সত্যস্বরূপ। তবে তাদের ভিতর বহিরঙ্গ বা প্রকাশ্য, এবং অন্তরঙ্গ বা গুহ্য মত আছে। মহম্মদ নিজে অবশ্য এটা বিশ্বাস করতেন না।

'হাশাশিন'* শব্দ থেকে ইংরেজী assassin (হত্যাকারী) শব্দ

---

* এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ও একাদশ শতাব্দীতে সিরিয়াতে বর্তমান ছিল—ইহারা ইহাদের নেতার আদেশানুসারে বিস্তর গুপ্ত হত্যা করিত। 'হাশাশিন' শব্দের অর্থ হাশিশ্-ভক্ষক। হাশিশ্ একপ্রকার মদ্য। এই সম্প্রদায়ের হত্যাকারীরা

এসেছে। মুসলমানদের একটি প্রাচীন সম্প্রদায় তাদের ধর্ম্মমতের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করে অবিশ্বাসী অর্থাৎ মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মারত।

মুসলমানদের উপাসনার সময় এক কুঁজো জল সাম্‌নে রাখতে হয়। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করে রয়েছেন, এটা তাঁরই প্রতীকস্বরূপ।

* * *

হিন্দুরা দশাবতারে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে নয় জন অবতার হয়ে গেছেন, দশম অবতার পরে আসবেন।

* * *

শঙ্করকে কখন কখন বেদের বাক্যসকল তৎপ্রচারিত দর্শনের সমর্থক—এইটি প্রমাণ করতে কূট তর্কের আশ্রয় নিতে হয়েছে। বুদ্ধ অন্য সকল ধর্ম্মাচার্য্যের চেয়ে বেশী সাহসী ও অকপট ছিলেন। তিনি বলে গেছেন, "কোন শাস্ত্রে বিশ্বাস করো না। বেদ মিথ্যা। যদি আমার উপলব্ধির সঙ্গে বেদ মিলে, সে বেদেরই সৌভাগ্য। আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র; যাগযজ্ঞ ও দেবোপাসনায় কোন ফল নেই।" মনুষ্য-জাতির মধ্যে বুদ্ধই জগৎকে প্রথমে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নীতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি মহজ্জীবনের জন্যই মহজ্জীবন যাপন করতেন, তিনি ভালবাসার জন্যই ভালবাসতেন; তাঁর অন্য অভিসন্ধি কিছু ছিল না।

শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মকে মনন করতে হবে, কারণ বেদ এইরূপ

ঐ মন্ত্র ব্যবহার করিয়া, হত্যাকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহাদের উক্ত নাম হইয়াছে।

বলছেন। বিচার অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সহায়ক। বেদ এবং স্বানুভূতি এই উভয়ই ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ। তাঁর মতে বেদ একপ্রকার অনন্ত জ্ঞানের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ। বেদের প্রমাণ এই যে, তা ব্রহ্ম হতে প্রসূত হয়েছে, আবার ব্রহ্মের প্রমাণ এই যে, বেদের মত অদ্ভুত গ্রন্থ ব্রহ্ম ব্যতীত আব কাবও প্রকাশ করবার সাধ্য নেই। বেদ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের খনিস্বরূপ; আর মানুষ যেমন নিঃশ্বাসের দ্বারা বায়ু বাইরে প্রক্ষেপ করে, সেইরূপ বেদও তার ভেতর থেকে প্রকাশিত হয়েছে; সেই জন্যই আমরা জানতে পাবি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জগৎ সৃষ্টি কবে থাকুন বা না থাকুন, তাতে বড় কিছু আসে যায় না; কিন্তু তিনি যে বেদ প্রকাশ করেছেন, এইটেই বড় জিনিস। বেদের সাহায্যেই জগৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে পেরেছে—তাঁকে জানবাব আর অন্য উপায় নেই।

শঙ্করের এই মত, অর্থাৎ বেদ সমুদয় জ্ঞানের খনি—এটা সমগ্র হিন্দুজাতির এমন মজ্জাগত হয়ে গেছে যে, তাদের মধ্যে একটা প্রবাদ এই যে, বেদে গরু হারালেও গরু পাওয়া যায়।

শঙ্কর আবও বলেন, কর্ম্মকাণ্ডেব বিধিনিষেধ মেনে চলাই জ্ঞান নয়। ব্রহ্মজ্ঞান কোনপ্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা, যাগযজ্ঞাদি-অনুষ্ঠান বা আমাদের মতামতের উপব নির্ভর করে না; যেমন একটা স্থাণুকে একজন ভূত মনে করছে বা অপর একজন স্থাণুজ্ঞান কবছে, তাতে স্থাণুব কিছু আসে যায় না।

আমাদের বেদান্তবেদ্য জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন; কারণ বিচার বা শাস্ত্রদ্বারা আমাদের ব্রহ্ম-উপলব্ধি হতে পারে না। তাঁকে সমাধি দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, আর বেদান্তই ঐ অবস্থালাভের উপায়

দেখিয়ে দেয়। আমাদের সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ভাব অতিক্রম করে সেই নির্গুণ ব্রহ্মে পৌছুতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্রহ্মকে অনুভব কচ্ছে; ব্রহ্ম ছাড়া আর অনুভব করবার দ্বিতীয় বস্তুই নেই। আমাদের ভিতর যেটা 'আমি' 'আমি' করছে, সেটইাই ব্রহ্ম। কিন্তু যদিও আমরা দিনরাত তাঁকে অনুভব করছি, তথাপি আমরা জানি না যে, তাঁকে অনুভব করছি। যে মুহূর্ত্তে আমরা ঐ সত্য জানতে পারি, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সব দুঃখকষ্ট চলে যায়; সুতরাং আমাদের ঐ সত্যকে জানতেই হবে। একত্ব-অবস্থা লাভ কর, তা হলে আর দ্বৈতভাব আসবে না। কিন্তু যাগযজ্ঞাদি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না; আত্মাকে অন্বেষণ, উপাসনা এবং সাক্ষাৎকার করা—এই সকলের দ্বারাই সেই জ্ঞানলাভ হবে।

ব্রহ্মবিদ্যাই পরা. বিদ্যা; অপরা বিদ্যা হচ্ছে বিজ্ঞান। মুণ্ডকোপনিষদ্ (সন্ন্যাসীদের জন্য উপদিষ্ট উপনিষদ্) এই উপদেশ দিচ্ছেন। দুই প্রকার বিদ্যা আছে—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে বেদের যে অংশে দেবোপাসনা ও নানাবিধ যাগযজ্ঞের উপদেশ—সেই কর্ম্মকাণ্ড এবং সর্ব্ববিধ লৌকিক জ্ঞানই অপরা বিদ্যা। যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে লাভ হয়, তাই পরা বিদ্যা। সেই অক্ষর পুরুষ নিজের মধ্য থেকেই সমুদয় সৃষ্টি কচ্ছেন—বাইরের অপর কিছু তাঁর উপর কার্য্য কচ্ছে না। সেই ব্রহ্মই সমুদয় শক্তিস্বরূপ, ব্রহ্মই যা কিছু আছে সব। যিনি আত্মযাজী, তিনিই কেবল ব্রহ্মকে জানেন। অজ্ঞানেরাই বাহ্য পূজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে; অজ্ঞানেরাই মনে করে কর্ম্মের দ্বারা আমাদের ব্রহ্মলাভ হতে পারে। যাঁরা সুষুম্নাবর্ত্মে (যোগীদের মার্গে) গমন করেন, তাঁরাই শুধু আত্মাকে লাভ করেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা

করতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে। সমষ্টিতেও যা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে; সমুদয়ই আত্মা থেকে প্রসূত হয়েছে। ওঙ্কার হচ্ছে যেন ধনু, আত্মা হচ্ছে যেন তীর, আর ব্রহ্ম হচ্ছেন লক্ষ্য। অপ্রমত্ত হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করতে হবে। তাঁতে মিশে এক হয়ে যেতে হবে।* সসীম অবস্থায় আমরা সেই অসীমকে কখনও প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরাই সেই অসীমস্বরূপ। এইটি জানলে আর কারও সঙ্গে তর্কবিতর্কের দরকার হয় না।

ভক্তি, ধ্যান ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করতে হবে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।" সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার কখনই জয় হয় না। সত্যের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মলাভের একমাত্র পথ রয়েছে; কেবল সেখানেই প্রেম ও সত্য বর্ত্তমান।

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

মায়ের ভালবাসা ব্যতীত কোন সৃষ্টিই স্থায়ী হতে পারে না। জগতের কোন কিছুই সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও নয়। জড় ও চিৎ পরস্পরসাপেক্ষ - একটা দ্বারাই অপরটার ব্যাখ্যা হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে একটা ভিত্তি আছে, এ বিষয়ে সকল আস্তিকই একমত, কেবল সেই ভিত্তিস্থানীয় বস্তুর প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধেই তাঁদের মতভেদ। জড়বাদীরা জগতের ঐরূপ কোন ভিত্তি আছে বলেই স্বীকার করে না।

---

* প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥—মুণ্ডক, ২।২।৪

সকল ধর্মের জ্ঞানাতীত বা তুরীয় অবস্থা এক। দেহজ্ঞান অতিক্রম করলে হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ—এমন কি, যারা কোনপ্রকার ধর্মমত স্বীকার করে না, সকলেরই ঠিক একই প্রকার অনুভূতি হয়ে থাকে।

* * *

যীশুর দেহত্যাগের পঁচিশ বৎসর পরে তৎ-শিষ্য টমাস (Apostle Thomas) কর্তৃক জগতের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এঙ্গ্লোস্তাকসনরা (Aglo Saxons) তখনও অসভ্য ছিল—গায়ে চিত্র-বিচিত্র আঁকত ও পর্বতগুহায় বাস করত। এক সময়ে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টিয়ান ছিল, কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ হবে।

খ্রীষ্টধর্ম চিরকালই তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য, খ্রীষ্টের ন্যায় নিরীহ মহাপুরুষের শিষ্যেরা এত নরহত্যা করেছে! বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্ম—জগতে এই তিনটিই প্রচারশীল ধর্ম। এদের পূর্ববর্তী তিনটি ধর্ম, যথা—হিন্দু, য়াহুদী ও জরতুষ্ট্রের (পারসী) ধর্ম কখনও প্রচার দ্বারা দলপুষ্টি করতে চেষ্টা করে নি। বৌদ্ধেরা কখনও নরহত্যা করে নি, তথাপি তারা শুধু কোমল ব্যবহারের দ্বারা এক সময় জগতের তিন-চতুর্থাংশ লোককে নিজমতে নিয়ে এসেছিল।

বৌদ্ধেরা ছিল সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তবিকই শূন্যবাদ বা অদ্বৈতবাদ, এই দুয়ের মাঝখানে যুক্তি কোথাও দাঁড়াতেই পারে না। বৌদ্ধেরা বিচারের দ্বারা সব কেটে দিয়েছিল—তারা তাদের মত যুক্তিতে যতদূর নিয়ে যাওয়া চলে তা নিয়ে গিয়েছিল। অদ্বৈতবাদীরাও তাদের মত যুক্তির চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই

এক অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে পৌছেছিল—যা থেকে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ ব্যক্ত হচ্ছে। বৌদ্ধ ও অদ্বৈতবাদী উভয়েরই একই সময়ে একত্ব ও বহুত্ব বোধ আছে। এই দুটি অনুভূতির মধ্যে একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা হবেই। শূন্যবাদী বলেন, বহুত্ববোধ সত্য; অদ্বৈতবাদী বলেন, একত্ববোধই সত্য; সমগ্র জগতে এই বিবাদই চলেছে। এই নিয়েই ধস্তাধস্তি (tug of war) চলেছে।

অদ্বৈতবাদী জিজ্ঞাসা করেন, শূন্যবাদী কোথাও একত্বের ভাব পান কি করে? ঘূর্ণ্যমান আলোটা বৃত্তাকার মনে হয় কি করে? একটা স্থিতি স্বীকার করলে তবেই না গতির ব্যাখ্যা হতে পারে? সব জিনিসের পশ্চাতে একটা অখণ্ড সত্তা প্রতীয়মান হচ্ছে, সেটা শূন্যবাদী বলেন ভ্রমমাত্র; কিন্তু এরূপ ভ্রমোৎপত্তির কারণ কি, তা তিনি কোনরূপে ব্যাখ্যা করতে পারেন না। আবার অদ্বৈতবাদীও বোঝাতে পারেন না যে, এক বহু হল কি করে। এর ব্যাখ্যা কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত অবস্থায় গেলেই পাওয়া যেতে পারে। আমাদের তুরীয় ভূমিতে উঠতে হবে, একেবারে অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যেতে হবে। উক্ত অবস্থায় যাবার শক্তি যেন একটি যন্ত্রস্বরূপ, আর ঐ যন্ত্রের ব্যবহার অদ্বৈতবাদীরই করায়ত্ত। তিনিই ব্রহ্মসত্তাকে অনুভব করতে সমর্থ; বিবেকানন্দ নামক মানুষটা নিজেকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিণত করতে পারে, আবার সেই অবস্থা থেকে মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। সুতরাং তার পক্ষে জগৎসমস্যার মীমাংসা হয়ে গেছে, আর গৌণভাবে অপরের পক্ষেও ঐ মীমাংসা হয়ে গেছে; কারণ সে অপরকে ঐ অবস্থায় পৌছুবার পথ দেখিয়ে দিতে পারে। এইরূপে বোঝা যাচ্ছে, যেখানে দর্শনের শেষ, সেখানে ধর্মের আরম্ভ। আর এইরূপ উপলব্ধি

দ্বারা জগতের কল্যাণ এই হবে যে, এখন যা জ্ঞানাতীত রয়েছে, কালে তা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে জ্ঞানগম্য হয়ে যাবে। সুতরাং জগতের ধর্ম্মলাভই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য; আর মানব অজ্ঞাতসারে এইটে অনুভব করেছে বলেই সে আবহমান কাল ধর্ম্মভাবকে আশ্রয় করে রয়েছে।

ধর্ম্ম যেন বহুগুণশালিনী পয়স্বিনী গাভী; সে অনেক লাথি মেরেছে, কিন্তু তাতে কি? সে অনেক দুধও দেয়। যে গরুটা দুধ দেয়, গোয়ালা তার লাথি সহ্য করে যায়।

'প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে' আছে, মহামোহ ও বিবেক এই দুই রাজায় লড়াই বেধেছিল। বিবেক রাজার সম্পূর্ণ জিত আর হয় না। অবশেষে বিবেক রাজার সঙ্গে উপনিষৎ দেবীর পুনর্ম্মিলন হয়, এবং তাঁদের প্রবোধরূপ পুত্রের জন্ম হল। আর সেই পুত্রের প্রভাবে তাঁর শত্রু বলে আর কেউ রইল না। তখন তাঁরা পরমসুখে বাস করতে লাগলেন। আমাদের প্রবোধ বা ধর্ম্মসাক্ষাৎকাররূপ মহৈশ্বর্যবান পুত্রলাভ করতে হবে। ঐ প্রবোধরূপ পুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করতে হবে, তা হলেই সে মস্ত একটা বীর হয়ে দাঁড়াবে।

ভক্তি বা প্রেমের দ্বারা বিনা চেষ্টায় মানুষের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একমুখী হয়ে পড়ে—স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই এর দৃষ্টান্ত। ভক্তিমার্গ স্বাভাবিক পথ এবং তাতে যেতেও বেশ আরাম। জ্ঞানমার্গ কি রকম?—না, যেন একটা প্রবল বেগশালিনী পার্ব্বত্য নদীকে জোর করে ঠেলে তার উৎপত্তিস্থানে নিয়ে যাওয়া। এতে অতি সত্বর বস্তুলাভ হয় বটে, কিন্তু বড় কঠিন। জ্ঞানমার্গ বলে, "সমুদয় প্রবৃত্তিকে নিরোধ কর।" ভক্তিমার্গ বলে, "স্রোতে গা ভাসান দাও, চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর।" এ পথ দীর্ঘ বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখকর।

ভক্ত বলেন—"প্রভো, চিরকালের জন্য আমি তোমার। এখন থেকে আমি যা কিছু করছি বলে মনে করি, তা বাস্তবিক তুমিই করছ—আর 'আমি' বা 'আমার' বলে কিছু নেই।"

"হে প্রভো, আমার অর্থ নেই যে, আমি দান করব; আমার বুদ্ধি নেই যে আমি শাস্ত্রশিক্ষা করব; আমার সময় নেই যে যোগ-অভ্যাস করব; হে প্রেমময়, আমি তাই তোমাকে আমার দেহমন অর্পণ করলাম।"

যতই অজ্ঞান বা ভ্রান্তধারণা আসুক, কিছুতেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যবধান ঘটাতে পারে না। ঈশ্বর বলে কেউ যদি না থাকেন, তথাপি প্রেমের ভাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক। কুকুরের মত পচা-মড়া খুঁজে খুঁজে মরার চেয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে করতে মরা ভাল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শকে লাভ করবার জন্য সারা জীবন নিয়োজিত কর। মৃত্যু যখন এত নিশ্চিত, তখন একটা মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য জীবনপাত করার চেয়ে আর বড় জিনিস কিছু নেই—"সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।"

ভক্তিদ্বারা বিনা আয়াসে জ্ঞানলাভ হয়—ঐ জ্ঞানের পর পরাভক্তি আসে।

জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, "ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন;" তাই সে সব মানে।

রাবিয়া

রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহ্যমান
নিজ শয্যা'পরে আছিলা শয়ান।

এহেন কালেতে নিকটে তাঁহার
আগমন হল দুই মহাত্মার ;—
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান,
পূজেন যাঁদের সব মুসলমান।
কহিলা হাসান সম্বোধিয়া তাঁরে,
"পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে,
যে শাস্তি ঈশ্বর দিউন তাহারে,
সহিষ্ণুতা-বলে বহন সে করে।"
পবিত্র মালিক—গভীরাত্মা যিনি,
বলিলেন নিজ অনুভব-বাণী,
"প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার,
আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার।"
রাবিয়া শুনিয়া দুঁহু সাধুবাণী,
স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গণি ;
কহিলা, "হে ঈশ, কৃপার ভাজন,
দুঁহু প্রতি এক করি নিবেদন—
যে জন দেখেছে প্রভুর বদন,
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন।
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার
উঠিবে না কভু এমত বিচার—
শান্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে ;
জানিবে না কভু শান্তি কারে বলে।"

—পারসী কবিতা

১২ই জুলাই, শুক্রবার

(অদ্য বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে পড়া হইতে লাগিল।)

'তৎ তু সমন্বয়াৎ'—ব্যাসসূত্র, ১।১।৪

আত্মা বা ব্রহ্মই সমুদয় বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

ঈশ্বরকে বেদান্ত থেকে জানতে হবে। সমুদয় বেদই জগৎকারণ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ঈশ্বরের কথা বলছে। সমুদয় হিন্দু দেবদেবীর উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় রয়েছেন। ঈশ্বর এই তিনের একীভাব।

বেদ তোমাকে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিতে পারে না। তুমি ত সেই ব্রহ্মই রয়েছ। বেদ করতে পারে এইটুকু যে, যে আবরণটা আমাদের চোখের সামনে থেকে সত্যকে আড়াল করে রেখেছে, সেইটেই দূর করতে সাহায্য করতে পারে। প্রথম চলে যায় অজ্ঞানাবরণ, তারপর যায় পাপ, তারপর বাসনা ও স্বার্থপরতা দূর হয়; সুতরাং সব দুঃখ-কষ্টের অবসান হয়। এই অজ্ঞানের তিরোভাব তখনই হতে পারে যখন আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্ম আর আমি এক; অর্থাৎ আপনাকে আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে দেখ, মানবীয় উপাধিগুলোর সঙ্গে নয়। দেহাত্মবুদ্ধি দূর করে দাও দেখি, তা হলেই সব দুঃখ দূর হবে। মনের জোরে রোগ ভাল করে দেওয়ার এই রহস্য। এই জগৎটা একটা সম্মোহনের (hypnotism) ব্যাপার, নিজের ওপর থেকে এই সম্মোহনের আবেশটা দূর করে ফেল, তা হলেই তোমার আর কষ্ট থাকবে না।

মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপ ত্যাগ করে পুণ্য উপার্জ্জন করতে হবে, তারপর পাপপুণ্য উভয়ই ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে রজঃ

দ্বারা তমঃকে জয় করতে হবে, পরে উভয়কেই সত্ত্বগুণে লয় করতে হবে—সর্ব্বশেষে এই তিন গুণকেই অতিক্রম করতে হবে। এমন একটা অবস্থা লাভ কর, যেখানে তোমার প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাস তাঁর উপাসনাস্বরূপ হবে। যখনই দেখ যে অপরের কথা থেকে কোন জিনিস শিখছ, জেনো যে পূর্ব্বজন্মে তোমার সেই বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছিল ; কারণ, অভিজ্ঞতাই আমাদের একমাত্র শিক্ষক।

যতই ক্ষমতালাভ হবে ততই দুঃখ বেড়ে যাবে, সুতরাং বাসনাকে একেবারে নাশ করে ফেল। কোন বাসনা করা যেন ভীমরুলের চাকে কাটি দেওয়া। আর বাসনাগুলো সোনার পাতমোড়া বিষের বড়ি—এইটে জানার নামই বৈরাগ্য।

'মন ব্রহ্ম নয়।' 'তত্ত্বমসি'—তুমিই সেই, 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম। যখন মানুষ এইটে উপলব্ধি করে, তখন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"—তার সব হৃদয়গ্রন্থি কেটে যায়, সব সংশয় ছিন্ন হয়। যতদিন আমাদের উপরে কেউ, এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত, থাকবেন ততদিন অভয় অবস্থালাভ হতে পারে না। আমাদের সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হয়ে যেতে হবে। যদি এমন কোন বস্তু থাকে যা ব্রহ্ম থেকে পৃথক তা চিরকালই পৃথক থাকবে ; তুমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে পৃথক হও, তুমি কখনও তাঁর সঙ্গে এক হতে পারবে না ; আবার বিপরীত-ক্রমে, যদি তুমি এক হও তা হলে কখনই পৃথক থাকতে পার না। যদি পুণ্যবলেই তোমার ব্রহ্মের সহিত যোগ হয়, তা হলে পুণ্যক্ষয়েই বিচ্ছেদ আসবে। আসল কথা, ব্রহ্মের সহিত তোমার নিত্য যোগ রয়েছে—পুণ্যকর্ম্ম কেবল আবরণটা দূর করবার সহায়তা করে। আমরা আজাদ অর্থাৎ মুক্ত, আমাদের এইটে উপলব্ধি করতে হবে।

'যমেবৈষ বৃণুতে'—যাঁকে এই আত্মা বরণ করেন *—এর তাৎপর্য্য, আমরাই আত্মা এবং আমরাই নিজেদের বরণ করি।

ব্রহ্মদর্শন কি আমাদের নিজেদের চেষ্টা ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করছে, অথবা বাইরের কারও সাহায্যের উপর নির্ভর করছে?—আমাদের নিজেদের চেষ্টাব উপর এটা নির্ভর করছে। আমাদের চেষ্টার দ্বারা আর্শির উপর যে ময়লা পড়ে রয়েছে, সেইটে অপসারিত হয়—আর্শি যেমন তেমনি থাকে। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এ তিনের বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই। যিনি জানেন যে তিনি জানেন না, তিনিই ঠিক ঠিক জানেন।† যিনি কেবল একটা মত অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি কিছুই জানেন না।

আমরা বদ্ধ, এই ধারণাটাই ভুল।

ধর্ম্ম জিনিসটা এ জগতের নয়; ধর্ম্ম হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির ব্যাপার; এই জগতের উপর এর প্রভাব গৌণ মাত্র। মুক্তি জিনিসটা আত্মার স্বরূপ হতে অভিন্ন। আত্মা সদা শুদ্ধ, সদা পূর্ণ, সদা অপরিণামী। এই আত্মাকে তুমি কখনও জানতে পার না। আমরা এই আত্মার সম্বন্ধে

---

* নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।
—কঠ উপ, ১।২।২৩

এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না, মেধা দ্বারা বা বহু শাস্ত্র-শ্রবণেও উহা লাভ হয় না। এই আত্মা যাঁকে বরণ (অর্থাৎ মনোনীত) করেন, তিনি তাঁকে লাভ করেন; তাঁর নিকটেই এই আত্মা নিজ রূপ প্রকাশ করেন।

† যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥ —কেন উপ, ২।৩

'নেতি নেতি' ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না। শঙ্কর বলেন, "যাকে আমরা মন বা কল্পনার সমুদয় শক্তিপ্রয়োগ করেও দূর করতে পারি না, তাই ব্রহ্ম।"

* * *

এই জগৎপ্রপঞ্চ ভাবমাত্র, আর বেদ এই ভাবপ্রকাশক শব্দরাশি-মাত্র। আমরা ইচ্ছামত এই জগৎপ্রপঞ্চকে সৃষ্টি করতে পারি, আবার নাশ করতে পারি। এক সম্প্রদায়ের কর্ম্মীদের মত এই যে, শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে তার অব্যক্ত ভাবটি জাগরিত হয়, আর ফলস্বরূপ একটি ব্যক্ত কার্য্য উৎপন্ন হয়। তাঁরা বলেন, আমরা প্রত্যেকেই এক একজন সৃষ্টিকর্ত্তা। শব্দবিশেষ উচ্চারণ করলেই তৎসংশ্লিষ্ট ভাবটি উৎপন্ন হবে, আর তার ফল দেখা যাবে। মীমাংসকসম্প্রদায় বলেন, "ভাব হচ্ছে শব্দের শক্তি, আর শব্দ হচ্ছে ভাবের অভিব্যক্তি।"

১৩ই জুলাই, শনিবার

আমরা যা কিছু জানি তাই মিশ্রণস্বরূপ, আর আমাদের সমুদয় বিষয়ানুভূতি বিশ্লেষণ হতে এসে থাকে। মনকে অমিশ্র, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বস্তু ভাবাই দ্বৈতবাদ। শাস্ত্র বা বই পড়ে দার্শনিক জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হয় না। বরং যত বই পড়বে ততই মন গুলিয়ে যাবে। যে-সব দার্শনিক তত চিন্তাশীল নন, তাঁরা ভাবতেন মনটা একটা অমিশ্র বস্তু; আর তাই থেকে তাঁরা 'স্বাধীন ইচ্ছা' নামক মতবাদে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র (Psychology) মনের অবস্থাসমূহের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে, মন একটা মিশ্রবস্তু; আর যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রবস্তু কোন না কোন বাহ্য শক্তিবলে বিধৃত থাকে, সেই

হেতু মন বা ইচ্ছাও বহিঃস্থ শক্তিসমূহের সংযোগে বিধৃত রয়েছে। এমন কি, যতক্ষণ না মানুষের ক্ষুধা পাচ্ছে, ততক্ষণ সে খাবার ইচ্ছা করতেও পারে না। ইচ্ছা বা সঙ্কল্প (will) বাসনার (desire) অধীন। কিন্তু তবুও আমরা স্বাধীন বা মুক্তস্বভাব—সকলেই এটা অনুভব করে থাকে।

অজ্ঞেয়বাদী বলেন, এই ধারণাটা ভ্রমমাত্র। তা হলে জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ কিরূপে হবে? এর এই মাত্র প্রমাণ যে, আমরা সকলেই জগৎ দেখছি ও তার অস্তিত্ব অনুভব করছি। তা হলে আমরা যে সকলে নিজে নিজেকে মুক্তস্বভাব বলে অনুভব করছি, এ অনুভবও যথার্থ না হবে কেন? যদি সকলে অনুভব করছে বলে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, তবে সকলেই যখন আপনাদের মুক্তস্বভাব বা স্বাধীনপ্রকৃতি বলে অনুভব করছে, তখন তারও অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। তবে ইচ্ছাটাকে আমরা যেমন দেখছি তার সম্বন্ধে 'স্বাধীন' কথাটা প্রয়োগ করা চলে না। মানুষের নিজ মুক্ত স্বভাব সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক বিশ্বাসই সমুদয় তর্কযুক্তিবিচারের ভিত্তি। 'ইচ্ছা' বদ্ধভাবাপন্ন হবার আগে যেরূপ ছিল, তাই মুক্ত স্বভাব। এই যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা—এতেই প্রতিমুহূর্ত্তে দেখাচ্ছে যে, মানুষ বন্ধন কাটাবার চেষ্টা করছে। একমাত্র বস্তু প্রকৃত মুক্তস্বভাব হতে পারে—তা অনন্ত, অসীম, দেশকালনিমিত্তের বাইরে। মানুষের ভিতর এক্ষণে যে স্বাধীনতা রয়েছে, সেটা একটা পূর্ব্বস্মৃতিমাত্র, স্বাধীনতা বা মুক্তিলাভের চেষ্টামাত্র।

জগতে সকল জিনিস যেন ঘুরে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করছে—তার উৎপত্তিস্থানে যাবার, তার একমাত্র যথার্থ উৎপত্তিস্থান আত্মার কাছে

যাবার চেষ্টা করছে। মানুষ যে সুখের অন্বেষণ করছে, সেটা আর কিছু নয়—সে যে সাম্যভাব হারিয়েছে, সেইটে পুনরায় পাবার চেষ্টা করছে। এই যে নীতিপালন, এও বদ্ধভাবাপন্ন ইচ্ছার মুক্ত হবার চেষ্টা, আর এই হতেই প্রমাণ হয় যে আমরা পূর্ণাবস্থা থেকে নেমে এসেছি।

* * *

কর্ত্তব্যের ধারণাটা যেন দুঃখরূপ মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড – আত্মাকে যেন দগ্ধ করে ফেলছে। "হে রাজন্, এই এক বিন্দু অমৃত পান করে সুখী হও।" (আত্মা অকর্ত্তা—এই ধারণাই অমৃত।)

কার্য্য চলুক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া যেন না আসে; কার্য্যেতে সুখই হয়ে থাকে, সমুদয় দুঃখ হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ফল। শিশু আগুনে হাত দেয়—তার সুখ হয় বলেই; কিন্তু যখনই তার শরীর প্রতিক্রিয়া করে তখনই পুড়ে যাওয়ার কষ্টবোধ হয়ে থাকে। ঐ প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ করতে পারলে আমাদের আর ভয়ের কারণ কিছু নেই। মস্তিষ্ককে নিজের বশে নিয়ে এস, যেন সে প্রতিক্রিয়াটার খবর না রাখতে পারে। সাক্ষিস্বরূপ হও, দেখো যেন প্রতিক্রিয়া না আসে, কেবল তা হলেই তুমি সুখী হতে পারবে। আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত্ত সেইগুলি, যে সময় আমরা নিজেদের একেবারে ভুলে যাই। স্বাধীনভাবে প্রাণ খুলে কাজ কর, কর্ত্তব্যের ভাব থেকে কাজ করো না। আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নেই। এই জগৎটা ত একটা খেলার আখ্ড়া—আমরা এখানে খেলছি; আমাদের জীবন ত অনন্ত আনন্দাবকাশ।

জীবনের সমগ্র রহস্য হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তোমার কি হবে, এ ভয় কখনও করো না, কারও উপর নির্ভর করো না। যখন

তুমি অপরের সাহায্যের আশাভরসা ছেড়ে দাও, কেবল সেই মুহূর্ত্তেই তুমি মুক্ত। যে স্পঞ্জটা পূরা জল শুষে নিয়েছে, সে আর জল টানতে পারে না।

* * *

আত্মরক্ষার জন্যও লড়াই করা অন্যায়, যদিও গায়ে পড়ে অপরকে আক্রমণ করার চেয়ে সেটা উঁচু জিনিস। 'ন্যায্য ক্রোধ' বলে কোন জিনিস নেই; কারণ, সকল বস্তুতে সমত্ববুদ্ধির অভাব থেকেই ক্রোধ এসে থাকে।

১৪ই জুলাই, রবিবার

ভারতের দর্শনশাস্ত্রের অর্থ হচ্ছে—যে শাস্ত্র বা যে বিদ্যা দ্বারা আমরা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার করতে পারি। দর্শন হচ্ছে ধর্ম্মের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং কোন হিন্দু কখনও ধর্ম্ম ও দর্শনের ভিতর সংযোগসূত্র কি, তা জানতে চাবে না।

দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীর তিনটি সোপান আছে: ১ম, স্থূল বস্তু-সমূহের পৃথক পৃথক জ্ঞান (concrete); ২য়, ঐগুলিকে এক এক শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা বা তাদের মধ্যে সামান্য আবিষ্কার করা (generalised); ৩য়, সেই সামান্যগুলির ভিতর আবার সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ঐক্য আবিষ্কার করা (abstract)। সমুদয় বস্তু যেখানে একত্বপ্রাপ্ত হয়, সেই চূড়ান্ত বস্তু হচ্ছেন অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা রূপবিশেষের সহায়তা গৃহীত হয়ে থাকে দেখা যায়; দ্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ পৌরাণিক বর্ণনা ও উপদেশের বাহুল্য; সর্ব্বশেষ অবস্থায় দার্শনিক তত্ত্বসমূহের বিবৃতি।

এদের মধ্যে প্রথম দুটি শুধু সাময়িক প্রয়োজনের জন্য, কিন্তু দর্শনই ঐ সকলের মূল ভিত্তিস্বরূপ, আর অন্যগুলি সেই চরমতত্ত্বে পৌঁছিবার সোপানস্বরূপমাত্র।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্ম্মের ধারণা এই—বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট ও খৃষ্ট ব্যতীত ধর্ম্মই হতে পারে না। য়াহুদীধর্ম্মেও মুশা ও প্রফেটদের সম্বন্ধে এই রকম এক ধারণা আছে। এরূপ ধারণার হেতু এই যে, এইসব ধর্ম্ম কেবল পৌরাণিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে। প্রকৃত সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম যা, তা এই সকল পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়ে ওঠে; সে ধর্ম্ম কখনও শুধু এদেরই উপর নির্ভর করতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই ধর্ম্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডটা যে এক অখণ্ড বস্তু, তা বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে। দার্শনিক যাকে সত্য বলেন, বৈজ্ঞানিক তাকেই জড় বলে থাকেন; কিন্তু ঠিক ঠিক দেখতে গেলে, এদের দুজনের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কারণ দুই-ই এক জিনিস। দেখ না, পরমাণু অদৃশ্য ও অচিন্ত্য, অথচ তাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে। বেদান্তীরাও আত্মা সম্বন্ধে ঠিক এই ভাবের কথাই বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে সব সম্প্রদায়ই বিভিন্ন ভাষায় ঐ এক কথাই বলছেন।

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ই জগতের কারণস্বরূপ এমন এক বস্তুকে নির্দ্দেশ করছেন যা হতে অন্য কিছুর সাহায্য ব্যতীত জগতের প্রকাশ হয়েছে। সেই এক কারণই নিমিত্ত, এবং সমবায়ী ও অসমবায়ী উপাদান-কারণ সবই। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা থেকে ঘট নির্ম্মাণ করছে; এখানে কুম্ভকার হচ্ছে নিমিত্ত-কারণ, মৃত্তিকা হচ্ছে সমবায়ী উপাদান-কারণ, আর কুম্ভকারের চক্র অসমবায়ী উপাদান-

কারণ। কিন্তু আত্মা এই তিনই। আত্মা কারণও বটেন, এবং অভিব্যক্তি বা কার্য্যও বটেন। বেদান্তী বলেন, এই জগৎটা সত্য নয়, এটা আপাতপ্রতীয়মান সত্তামাত্র। প্রকৃতি আর কিছুই নয়, অবিদ্যাবরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্রহ্মমাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর প্রকৃতি বা এই জগৎপ্রপঞ্চ হয়েছেন; অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ঈশ্বর এই জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন বটে, কিন্তু তিনি জগৎ নন।

আমরা অনুভূতি বিশেষকে একটা মানসিক প্রক্রিয়ারূপেই জানতে পারি—একে মানসিক একটি ঘটনারূপে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটা দাগরূপে জানতে পারি। আমরা মস্তিষ্ককে সম্মুখে বা পশ্চাতে চালাতে পারি না, কিন্তু মনকে পারি। মনকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান —সমুদয় কালেই প্রসারিত করা যেতে পারে। সুতরাং মনের মধ্যে যা যা ঘটে, তা অনন্তকালের জন্য সঞ্চিত থাকে। মনের মধ্যে সব ঘটনা পূর্ব্ব থেকেই সংস্কারের আকারে রয়েছে; মন সর্ব্বব্যাপী কি না।

দেশকালনিমিত্ত যে চিন্তারই প্রণালীবিশেষ—এই আবিষ্ক্রিয়াই ক্যান্টের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। কিন্তু বেদান্ত বহু পূর্ব্বে এই কথা শিখিয়ে গেছে, আর একে মায়া নামে অভিহিত করেছে। সোপেনহাওয়ার কেবল যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে বেদোক্ত তত্ত্বগুলি যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কর বেদকে আর্ষ বলে গেছেন।

* * *

অনেকগুলি বৃক্ষ দেখে তাদের যে সাধারণ ধর্ম্ম বৃক্ষত্ব—তার আবিষ্কারের নামই জ্ঞান। আর সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে সেই এক বস্তুর জ্ঞান।...

সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের চরম সামান্য বা সাধারণ ভাবই সগুণ ঈশ্বর; কেবল সেটা অস্পষ্ট, এবং সুনির্দ্দিষ্ট ও দার্শনিক বিচারসম্মত নয়।...

সেই এক তত্ত্ব স্বয়ং অভিব্যক্ত হচ্ছে, তা থেকেই যা কিছু সব হয়েছে।...

পদার্থবিজ্ঞানের কার্য্য ঘটনাবলীর আবিষ্কার, আর দর্শন যেন ঐ বিভিন্ন ঘটনারূপ ফুলগুলো নিয়ে তোড়াবাঁধবার সুতো। চিন্তাসহায়ে ঐক্য-আবিষ্কারের চেষ্টামাত্রই দর্শনের এলাকায়। এমন কি, একটা গাছের গোড়ায় সার দেওয়ার ব্যাপারটাতেও এইরূপ একটা ঐক্যাবিষ্কাব-প্রণালীর (Process of Abstraction) সহায়তা নিতে হয়।...

ধর্ম্মের ভিতর স্থূল, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তত্ত্ব, ও চরম একত্ব—এই তিন ভাবই আছে। কেবল স্থূল বা বিশেষ নিয়েই পড়ে থেকো না। সেই চরম সূক্ষ্ম তত্ত্বে, সেই একত্বে চলে যাও।

* * *

অসুরেরা তমঃপ্রধান যন্ত্র, দেবতারা সত্ত্বপ্রধান যন্ত্র; কিন্তু দুই-ই যন্ত্র। মানুষই কেবল যন্ত্রবৎ নয়। যন্ত্রবৎ ভাবটাকে দূর করে দাও; দেব-অসুর, দুই হতেই তুমি শ্রেষ্ঠ—এইটে ধারণা কর, তবেই তুমি মুক্ত হতে পারবে। এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান, যেখানে মানুষ নিজের মুক্তিসাধন করতে পারে।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—এই আত্মা যাকে বরণ করেন, এ কথাটা সত্য। বরণ বা মনোনীত করাটা সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে এর অর্থ করতে হবে। বাইরে থেকে কেউ বরণ করছে—কথাটার যদি এইরূপ অদৃষ্টবাদমূলক ব্যাখ্যা করা যায়, তবে ত এটা ভয়ানক কথা হয়ে দাঁড়ায়।

১৫ই জুলাই, সোমবার

যেখানে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, যেমন তিব্বতে, তথায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের চেয়ে অধিক বলবান হয়ে থাকে। যখন ইংরেজেরা ঐ দেশে যায়, এই স্ত্রীলোকেরা জোয়ান জোয়ান পুরুষদের ঘাড়ে নিয়ে পাহাড় চড়াই করে।

মালাবার দেশে অবশ্য স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ নাই, কিন্তু তথায় সব বিষয়ে স্ত্রীলোকদের প্রাধান্য। তথায় সর্ব্বত্রই বিশেষভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার দিকে নজর দেখা যায়, আর বিদ্যাচর্চ্চায় যার পর নাই উৎসাহ। আমি যখন ঐ দেশে গিয়েছিলাম, আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখেছিলাম, যারা উত্তম সংস্কৃত বলতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্যত্র দশ লক্ষের মধ্যে একজনও পারে কি না, সন্দেহ। স্বাধীনতায় উন্নতি হয়, কিন্তু দাসত্ব থেকে অবনতিই হয়ে থাকে। পর্ত্তুগীজ বা মুসলমানেরা কখন মালাবার জয় করে নি।

দ্রাবিড়ীরা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্য্যজাতি—আর্য্যদের পূর্ব্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ীরাই সব চেয়ে সভ্য ছিল। তাদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীর সামাজিক অবস্থা উন্নত ছিল। পরে তারা ভাগ হয়ে গেল; কতকগুলি মিশরে, কতকগুলি বাবিলোনিয়ায় চলে গেল, অবশিষ্ট ভাগ ভারতেই রইল।

১৬ই জুলাই, মঙ্গলবার।

শঙ্কর

অদৃষ্ট (অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বা সংস্কার) আমাদিগকে যাগযজ্ঞ উপাসনাদি করায়, তা থেকে ব্যক্ত ফল উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদিগকে ব্রহ্মসম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তারপর নিদিধ্যাসন করতে হবে।

কর্ম্মের ফল আর জ্ঞানের ফল সম্পূর্ণ পৃথক্। Morality বা বৈধী ধর্ম্মের মূল হচ্ছে—"এই কাজ করো" এবং "এই কাজ করো না"; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের দেহমনের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এদের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত; সুতরাং সুখদুঃখ ভোগ করতে গেলেই শরীরের প্রয়োজন। যার দেহ যত শ্রেষ্ঠ হবে, তাঁর ধর্ম্ম বা পুণ্যের আদর্শও তত উচ্চতর হবে; এই রকম ব্রহ্মার পর্য্যন্ত। কিন্তু সকলেরই শরীর আছে। আর যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ সুখদুঃখ থাকবেই; কেবল দেহাতীত বা বিদেহ হলেই সুখদুঃখকে একেবারে অতিক্রম করা যেতে পারে। শঙ্কর বলেন, আত্মা বিদেহ।

কোন বিধিনিষেধের দ্বারা মুক্তিলাভ হতে পারে না। তুমি সদা মুক্তই আছ। যদি তুমি পূর্ব্ব হতেই মুক্ত না থাক, কিছুই তোমায় মুক্তি দিতে পারে না। আত্মা স্বপ্রকাশ। কার্য্যকারণ আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—এই বিদেহ অবস্থার নামই মুক্তি। ব্রহ্ম ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সমুদয়ের পারে। যদি মুক্তি কোন কর্ম্মের ফলস্বরূপ হ'ত, তবে তার কোন মূল্যই থাকত না, সেটা একটা

যৌগিক বস্তু হ'ত, সুতরাং তার ভিতর বন্ধনের বীজ নিহিত থাকত। এই মুক্তিই আত্মার একমাত্র নিত্য সঙ্গী, তাকে লাভ করতে হয় না, সেটা আত্মার যথার্থ স্বরূপ।

তবে আত্মার উপর যে আবরণ পড়ে রয়েছে, সেইটে সরাবার জন্য—বন্ধন ও ভ্রম দূর করবার জন্য—কর্ম্ম ও উপাসনার প্রয়োজন; এরা মুক্তি দিতে পারে না বটে, কিন্তু তথাপি আমরা যদি নিজেরা চেষ্টা না করি, তা হলে আমাদের চোখ ফোটে না, আমরা আমাদের স্বরূপ জানতে পারি না। শঙ্কর আরও বলেন, অদ্বৈতবাদই বেদের গৌরবমুকুটস্বরূপ; কিন্তু বেদের নিম্নভাগগুলিরও প্রয়োজন আছে, কারণ তারা আমাদের কর্ম্ম ও উপাসনার উপদেশ দিয়ে থাকে, আর এইগুলির সহায়তায়ও অনেকে ভগবানের কাছে গিয়ে থাকে। তবে এমন অনেকে থাকতে পারে, যারা কেবল অদ্বৈতবাদের সাহায্যেই সেই অবস্থায় যাবে। অদ্বৈতবাদ যে অবস্থায় নিয়ে যায়, কর্ম্ম ও উপাসনাও সেই অবস্থাতেই নিয়ে যায়।

শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতে পারে না, কেবল অজ্ঞান দূর করে দিতে পারে। তাদের কার্য্য নাশাত্মক (negative)। শঙ্করের প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, তিনি শাস্ত্রও মেনেছিলেন, অথচ সকলের সামনে মুক্তির পথও খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যাই বল, তাঁকে ঐ নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে হয়েছে; প্রথমে মানুষকে একটা স্থূল অবলম্বন দাও, তারপর ধীরে ধীরে তাকে সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাও। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম এই চেষ্টাই করছে, আর এ থেকে বুঝা যায়—কেন ঐ সকল ধর্ম্ম জগতে এখনও রয়েছে এবং কি করে প্রত্যেকটিই মানুষের উন্নতির কোন না কোন অবস্থায়

উপযোগী। শাস্ত্র যে অবিদ্যা দূর করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, সে নিজেই যে সেই অবিদ্যার অন্তর্গত। শাস্ত্রের কার্য্য হচ্ছে জ্ঞানের উপর যে অজ্ঞানরূপ আবরণ এসে পড়েছে, তাকে দূর করা। "সত্য অসত্যকে দূর করে দেবে।" তুমি মুক্তই আছ, তোমাকে আবার কিসে মুক্ত করে দেবে? যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ধর্ম্মমতবিশেষ অবলম্বন করে আছ, ততক্ষণ তুমি ব্রহ্মকে লাভ কর নি। "যিনি মনে করেন আমি জানি, তিনি জানেন না।" যিনি স্বয়ং জ্ঞাতস্বরূপ, তাঁকে কে জানতে পারে? দুটি বস্তু আছে—ব্রহ্ম ও জগৎ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম অপরিণামী, জগৎ পরিণামী। জগৎ অনন্তকাল ধরে রয়েছে। তোমরা ত অনন্ত তাকেই বলে থাক, যেখানে কতখানি পরিণাম হচ্ছে মন তা ধরতে পারে না। জগৎ ও ব্রহ্ম এক বটে, কিন্তু এক সময়ে ত তোমরা দুটো দেখতে পাও না—একখানা পাথরের উপর একটা ছবি খোদাই করা রয়েছে; যখন তোমার পাথরের দিকে খেয়াল থাকে, তখন খোদাই-এর দিকে থাকে না; আবার যখন খোদাই-এর দিকে খেয়াল দাও, তখন পাথরের খেয়াল থাকে না।

* * *

তুমি কি এক মুহূর্ত্তের জন্যই আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির করতে পার? সকল যোগীই বলেন, এটা করা সম্ভব।

* * *

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে নিজেকে দুর্ব্বল ভাবা। তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। যে-কোন বস্তুতে তুমি শক্তির বিকাশ দেখ, সে শক্তি তোমারই দেওয়া।

আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের উপরে। শিক্ষা দাও যে, মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। মন্দ বলে কিছু আছে এটি স্বীকার করো না, যা নেই তাকে আর নূতন করে সৃষ্টি করো না। সদর্পে বল—আমি প্রভু, আমি সকলের প্রভু। আমরাই নিজের নিজের শৃঙ্খল গড়েছি, আর আমরাই কেবল ঐ শিকল ভাঙ্গতে পারি।

কোন প্রকার কর্ম্ম তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হতে পারে। জ্ঞান অপ্রতিরোধনীয়; ইচ্ছা হল তাকে গ্রহণ করলাম, ইচ্ছা হল ত্যাগ করলাম—মন এরূপ করতেই পারে না। যখন জ্ঞানোদয় হবে, মনকে তা গ্রহণ করতেই হবে। সুতরাং এই জ্ঞানলাভ মনের কার্য্য নয়। তবে মনে ঐ জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে থাকে বটে।

কর্ম্ম বা উপাসনার ফল এইটুকু যে, ওতে তোমার যে স্বরূপ ভুলেছিলে, তাতে ফের পৌঁছে দেয়। আত্মা যে দেহ, এইটে মনে করাই সম্পূর্ণ ভ্রম; সুতরাং আমরা এই শরীরে থাকতে থাকতেই মুক্ত হতে পারি। দেহের সঙ্গে আত্মার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। মায়ার অর্থ 'কিছু না' নয়, মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করা।

১৭ই জুলাই, বুধবার

রামানুজ জগৎপ্রপঞ্চকে চিৎ (জীবাত্মা বা সাধারণ জ্ঞানভূমি), অচিৎ (জড়প্রকৃতি বা জ্ঞানের অধোভূমি), এবং ঈশ্বর (জ্ঞানাতীত ভূমি বা তুরীয় ভূমি)—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। শঙ্কর কিন্তু বলেন, চিৎ বা জীবাত্মা, এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর এক বস্তু। ব্রহ্ম

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ; ঐ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত তাঁর গুণ নয়। ঈশ্বরকে চিন্তা করতে গেলেই তাঁকে বিশিষ্ট করা হয়; তাঁর সম্বন্ধে বড় জোর 'ওঁ তৎসৎ', অর্থাৎ তিনি সত্তাস্বরূপ, তিনি অস্তিস্বরূপ, এই মাত্র বলা যেতে পারে।

শঙ্কর আরও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্তু হতে পৃথক করে দেখতে পার? দুটি বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন্ খানে? ইন্দ্রিয়জ্ঞানে নয়, কারণ তা হলে সব জিনিসই এক রকম বোধ হত। আমাদের বিষয়জ্ঞান একটার পর আর একটা, এই ক্রমে হয়ে থাকে। একটা বস্তু কি তা জানতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা কি নয়, তাও তোমাদের জানতে হয়। দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্যগুলি আমাদের স্মৃতির মধ্যে অবস্থিত, আর মস্তিষ্কে যা সঞ্চিত রয়েছে, তারই সঙ্গে তুলনা করে আমরা এগুলি জানতে পারি। ভেদ, বস্তুর স্বরূপের মধ্যে নেই, সেটা আমাদের মস্তিষ্কে রয়েছে। বাইরে এক অখণ্ড বস্তুই রয়েছে; ভেদ কেবল ভেতরে, আমাদের মনে, সুতরাং বহুজ্ঞান মনেরই সৃষ্টি।

এই বিশেষগুলিই গুণপদবাচ্য হয়, যখন তারা পৃথক থাকে, অথচ কোন একটি জিনিসের সহিত জড়িত থাকে। এই বিশেষ জিনিসটা কি আমরা ঠিক করে বলতে পারি নে। আমরা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে দেখতে পাই ও অনুভব করি কেবল সত্তা, অস্তিত্ব। আর যা কিছু সব আমাদেরই মধ্যে রয়েছে। কোন বস্তুর সত্তা সম্বন্ধেই শুধু আমরা নিঃসংশয় প্রমাণ পেয়ে থাকি। বিশেষ বা ভেদগুলি প্রকৃতপক্ষে গৌণভাবে সত্য—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। কারণ, ঐ সর্পজ্ঞানেরও সত্যতা আছে;—কেননা অযথার্থভাবে হলেও

একটা কিছু ত দেখা যাচ্ছে। যখন রজ্জুজ্ঞানের লোপ হয়, তখনই সর্পজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, আবার বিপরীতক্রমে সর্পজ্ঞানের লোপে রজ্জুজ্ঞানের আবির্ভাব। কিন্তু তুমি একটা মাত্র জিনিস দেখছ বলে প্রমাণ হয় না যে, অন্য জিনিসটা নেই। জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে তাকে আবরণ করে রেখেছে, তাকে দূর করতে হবে, কিন্তু ওরও যে অস্তিত্ব আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।

শঙ্কর আবও বলেন যে, অনুভূতিই (perception) অস্তিত্বের চরম প্রমাণ। অনুভূতি স্বয়ংজ্যোতিঃ ও স্বয়ংপ্রকাশ; কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বাইরে যেতে গেলে আমরা তাকে ছাড়তে পারি না। অনুভূতি কোন ইন্দ্রিয় বা করণসাপেক্ষ নয়, এটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অনুভূতি সংজ্ঞা (consciousness) ব্যতীত হতে পারে না; অনুভব স্বপ্রকাশ; তারই আংশিক প্রকাশকে সংজ্ঞা বলে। কোন প্রকার অনুভবক্রিয়াই সংজ্ঞারহিত হতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অনুভূতির স্বরূপই হচ্ছে সংজ্ঞা। সত্তা আর অনুভব এক বস্তু, দুটো পৃথক পৃথক জিনিস এক সঙ্গে জোড়া নয়। আর যার কোন কারণ নেই তাই অনন্ত, সুতরাং অনুভূতি যখন নিজেই নিজের চরম প্রমাণ, তখন অনুভূতিও অনন্তস্বরূপ; এটা সর্ব্বদাই স্বয়ংবেদ্য। অনুভূতি স্বয়ংই নিজের জ্ঞাতাস্বরূপ; এটা মনের ধর্ম্ম নয়, কিন্তু তা হতেই মন হয়েছে; এইটেই পূর্ণ ও একমাত্র জ্ঞাতা, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অনুভূতিই আত্মা। এটা স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, কিন্তু সাধারণ অর্থে একে জ্ঞাতা বলা যেতে পারে না; কারণ, তাতে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়। কিন্তু শঙ্কর বলেন, আত্মা অহং মন,

কারণ তাঁতে 'আমি আছি' এই ভাবটি নেই। আমরা সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর আত্মা ও ব্রহ্ম এক।

যখনই তুমি সেই পূর্ণব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বল বা ভাব, তখনই আপেক্ষিকভাবে সেগুলি করতে হয়, সুতরাং সেখানে এই সকল যুক্তিবিচার খাটে। কিন্তু যোগাবস্থায় অনুভূতি ও অপরোক্ষানুভূতি এক হয়ে যায়; রামানুজব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আংশিকভাবে একত্বদর্শন; সুতরাং সেটাও সেই অদ্বৈতাবস্থার এক সোপানস্বরূপ। 'বিশিষ্ট' মানেই ভেদযুক্ত। 'প্রকৃতি' মানে জগৎ, আর তার সদা পরিণাম হচ্ছে। পরিণামী চিন্তারাশি পরিণামশীল শব্দরাশি দ্বারা অভিব্যক্ত হয়ে কখনও সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রমাণ করতে পারে না। ঐরূপ করে আমরা শুধু এমন একটা জিনিসে উপনীত হই যা থেকে কতকগুলি গুণ বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ নয়। আমরা কেবল শব্দগত একত্বে পৌঁছাই, তার চেয়ে আর চরম ঐক্য বার করা যায় না, কিন্তু তাতে আপেক্ষিক জগতের বিলোপসাধন হয় না।

১৮ই জুলাই, বৃহস্পতিবার

(অদ্যকার আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ সাংখ্যদর্শনের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিগুলি।)

সাংখ্যেরা বলেন, জ্ঞান একটি মিশ্র পদার্থ, আর তারও পারে বিশ্লেষণ করতে করতে গিয়ে শেষে আমরা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের অস্তিত্ব অবগত হই। এই পুরুষ সংখ্যায় বহু; আমরা প্রত্যেকেই এক একটি পুরুষ। অদ্বৈতবেদান্ত কিন্তু এর বিরুদ্ধে বলেন, পুরুষ কেবল একমাত্র হতে পারে; পুরুষের জ্ঞান, অজ্ঞান বা আর কিছু গুণ বা ধর্ম্ম থাকতে

পাবে না, কারণ গুণ থাকলেই সেগুলি তাব বন্ধনের কারণ হবে, আর পরিণামে সেগুলির লোপও হবে। অতএব সেই এক বস্তু অবশ্যই সর্ব্বপ্রকারগুণরহিত, এমন কি, জ্ঞান পর্য্যন্ত তাতে থাকতে পারে না, আর তা জগৎ বা আর কিছুব কারণ হতে পারে না। বেদ বলেন, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—হে সৌম্য, প্রথমে সেই এক অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন।

*　　*　　*

যেখানে সত্ত্বগুণ, সেইখানেই জ্ঞান দেখা যায় বলে এ প্রমাণ হয় না যে সত্ত্বই জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ। বরং মানবের ভিতর জ্ঞান পূর্ব্ব হতেই রয়েছে, সত্ত্বেব সান্নিধ্যে সেই জ্ঞানপ্রকাশ হয় মাত্র। যেমন আগুনেব কাছে একটা লৌহগোলক বাখলে ঐ আগুন লৌহগোলকটার ভিতর পূর্ব্ব হতেই যে তেজ অব্যক্তভাবে ছিল, তাকেই প্রকাশ ক'রে গোলকটাকে উত্তপ্ত করে—তার ভিতরে প্রবেশ করে না, সেই রকম।

শঙ্কর বলেন, জ্ঞান একটা বন্ধন নয়, কারণ এ সেই পুরুষ বা ব্রহ্মের স্বরূপ। জগৎ ব্যক্ত বা অব্যক্তরূপে সর্ব্বদাই রয়েছে, সুতরাং সে জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞেয় বস্তুর কোন কালে অভাব হয় না।

জ্ঞান-বল-ক্রিয়াই ঈশ্বর। জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর দেহেন্দ্রিয়াদি কোন আকারেরই প্রয়োজন নাই—যে সসীম, তার পক্ষে সেই অনন্ত জ্ঞানকে ধ'রে রাখবার জন্য একটা প্রতিবন্ধকের (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির) প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের ঐরূপ সহায়তার আদৌ কোন আবশ্যকতা নেই। বাস্তবিক এক আত্মাই আছেন, বিভিন্ন-লোকগামী জীবাত্মা বলে স্বতন্ত্র আত্মা কিছু নেই। পঞ্চ প্রাণ যাঁতে একীভূত হয়েছে, এই দেহের সেই চেতন নিয়ন্তাকেই জীবাত্মা বলে, কিন্তু সেই জীবাত্মাই পরমাত্মা,

যেহেতু আত্মাই সব। তুমি তাকে যে অন্যরূপ বোধ করছ, সে ভ্রান্তি তোমারই, জীবে সে ভ্রান্তি নেই। তুমিই ব্রহ্ম, আর তুমি আপনাকে আর যা কিছু বলে ভাবছ, তা ভুল। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বলে পূজা করো না, কৃষ্ণের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন, তাঁরই উপাসনা কর। শুধু আত্মার উপাসনাতেই মুক্তিলাভ হবে। এমন কি, সগুণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সেই আত্মার বহিঃপ্রকাশমাত্র। শঙ্কর বলেছেন "স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।"—নিজস্বরূপের আন্তরিক অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলে।

আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য যত বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে থাকি, সে সব সত্য। কেবল, যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখাতে হলে তার আশপাশের নক্ষত্রগুলার সাহায্য নিতে হয়, এও তেমনি।

* * *

ভগবদ্গীতা বেদান্ত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১৯শে জুলাই, শুক্রবার

যতদিন আমার 'আমি' 'তুমি' এইরূপ ভেদজ্ঞান রয়েছে, ততদিন একজন ভগবান আমাদের রক্ষা করছেন, এ কথা বলবারও আমার অধিকার আছে। যতদিন আমার এইরূপ ভেদবোধ রয়েছে, ততদিন এই ভেদবোধ থেকে যে-সকল অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত আসে সেগুলিও নিতে হবে, 'আমি' 'তুমি' স্বীকার করলেই আমাদের আদর্শস্থানীয় আর এক তৃতীয় বস্তু স্বীকার করতে হবে, যা এই দুয়ের মাঝখানে আছে; সেইটিই ঈশ্বর—ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুস্বরূপ—যেমন বাষ্প থেকে জল হয়, সেই জল আবার গঙ্গাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। বাষ্পাবস্থা যখন, তখন আর গঙ্গা বলা যায় না; আবার জল যখন, তখন তাকে বাষ্প

বলা যায় না। সৃষ্টি বা পরিণামের ধারণার সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ধারণা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা জগৎকে গতিশীল দেখছি, ততদিন তার পশ্চাতে ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব আমাদের স্বীকার করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, পদার্থবিজ্ঞান তা প্রমাণ করে দেয়; আমরা কোন জিনিসকে যেমন দেখি, শুনি, স্পর্শ ঘ্রাণ বা আস্বাদ করি, স্বরূপতঃ জিনিসটা বাস্তবিক তা নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের স্পন্দন বিশেষ বিশেষ ফল উৎপাদন করছে, আর সেইগুলো আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করছে; আমরা কেবল আপেক্ষিক সত্য জানতে পারি।

'সত্য' শব্দ 'সৎ' থেকে এসেছে। যা 'সৎ' অর্থাৎ যা 'আছে,' যেটি 'অস্তিস্বরূপ' সেইটিই সত্য। আমাদের বর্ত্তমান দৃষ্টি থেকে এই জগৎপ্রপঞ্চ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির প্রকাশ বলে বোধ হচ্ছে। আমাদের অস্তিত্ব যতটুকু সত্য, সগুণ ঈশ্বরও ততটুকু সত্য, তদপেক্ষা অধিক সত্য নয়। আমাদের রূপ যেমন দেখা যায়, ঈশ্বরকেও তদ্রূপ সাকারভাবে দেখা যেতে পারে। যতদিন আমরা মানুষ রয়েছি, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন; আমরা যখন নিজেরা ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যাব, তখন আর আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকবে না। সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জগজ্জননীকে তাঁর কাছে সদাসর্ব্বদা বর্ত্তমান দেখতেন—তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাঁকে সত্য দেখতেন; কিন্তু সমাধি অবস্থায় তাঁর আত্মা ব্যতীত আর কিছুর অনুভব থাকত না। সেই সগুণ ঈশ্বর ক্রমশঃ আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকেন, শেষে তিনি যেন গলে যান, তখন 'ঈশ্বর'ও থাকে না, 'আমি'ও থাকে না—সব সেই আত্মায় লয় হয়ে যায়।

আমাদের এই জ্ঞান একটা বন্ধনস্বরূপ। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার কল্পনা-রূপ এক মত আছে, তাতে রূপাদিসৃষ্টির পূর্ব্বে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে লওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান যদি কিছুর কারণ হয়, তাও আবার অপর কিছুর কার্যস্বরূপ। একেই বলে মায়া। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেন, আবার আমরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি করি—এই হ'ল মায়া। সর্ব্বত্র এইরূপ চক্রগতি দেখা যায়। মন দেহকে সৃষ্টি করছে, আবার দেহ মনকে সৃষ্টি করছে—ডিম থেকে পাখী, আবার পাখী থেকে ডিম ; গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ। এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্পূর্ণ বৈষম্যভাবাপন্ন নয়, আবার সম্পূর্ণ সাম্যভাবাপন্নও নয়। মানুষ স্বাধীন—তাকে এই দুই ভাবের উপরে উঠতে হবে। এ দুটোই নিজ নিজ প্রকাশভূমিতে সত্য বটে, কিন্তু সেই যথার্থ সত্য, সেই অস্তিস্বরূপকে লাভ করতে গেলে আমরা এক্ষণে যা কিছু অস্তিত্ব, ইচ্ছা, জ্ঞান, করা, যাওয়া, জানা বলে জানি, সে-সব অতিক্রম করতে হবে। জীবাত্মার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব নেই—ওটা মিশ্র বস্তু বলে কালে খণ্ড খণ্ড হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে আর কোনরূপে বিশ্লেষণ করা যায় না, কেবল সেই বস্তুই অমিশ্র এবং কেবল সেইটিই সত্যস্বরূপ, মুক্তস্বভাব, অমৃত ও আনন্দস্বরূপ। এই ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করবার জন্য যত চেষ্টা, সবই বাস্তবিক পাপ—আর ঐ স্বাতন্ত্র্যকে নাশ করবার সমুদয় চেষ্টাই ধর্ম্ম বা পুণ্য। এই জগতে সবই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে। চারিত্র্যনীতির (morality) ভিত্তি হচ্ছে এই পার্থক্যজ্ঞান বা ভ্রমাত্মক স্বাতন্ত্র্যকে ভাঙ্গবার চেষ্টা, কারণ এইটেই সকল প্রকার পাপের মূল ; চারিত্র্যনীতি জিনিসটা পূর্ব্ব হতেই রয়েছে, উহা কারও মনগড়া জিনিস নয়, পরে ধর্ম্মশাস্ত্র উহাকে বিধিবদ্ধ করেছে মাত্র। প্রথমে সমাজে নানাবিধ প্রথা

স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের ব্যাখ্যার জন্য পরে পুরাণের উৎপত্তি। যখন ঘটনাসকল ঘটে যায় তখন তারা যুক্তি-বিচার হতে উচ্চতর কোন নিয়মেই ঘটে থাকে, যুক্তিবিচারের আবির্ভাব হয় পরে, ঐ গুলিকে বোঝবার জন্য। যুক্তিবিচারের কোন কিছু ঘটাবার শক্তি নেই, এ যেন ঘটনাগুলা ঘটে যাবার পরে তাদের জাবরকাটা। যুক্তিতর্ক যেন মানবের কার্য্যকলাপের ঐতিহাসিক (historian)।

* * *

বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন, (কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের শাখাবিশেষ মাত্র) আর শঙ্করকেও কেউ কেউ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলত। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন—শঙ্কর সেইগুলো সংশ্লেষণ করলেন। বুদ্ধ কখনও বেদ, বা জাতিভেদ, বা পুরোহিত, বা সামাজিক প্রথা—কারো কাছে মাথা নোয়ান নি! তিনি যতদূর পর্য্যন্ত যুক্তিবিচার চলতে পারে, ততদূর নির্ভীকভাবে যুক্তিবিচার করে গেছেন। এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখে নি। বুদ্ধ যেন ধর্ম্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য, যেমন ওয়াশিংটন মার্কিনজাতির জন্য করেছিলেন। তিনি নিজের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করতেন না।

২০শে জুলাই, শনিবার

প্রত্যক্ষানুভূতিই যথার্থ জ্ঞান বা যথার্থ ধর্ম্ম। অনন্ত যুগ ধরে আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি কেবল কথা কয়ে যাই, তাতে কখনই আমাদের আত্মজ্ঞান হতে পারে না। কেবল মতবিশেষে বিশ্বাসী হওয়া ও

নাস্তিকতায় কিছু তফাৎ নেই। বরং ঐরূপ আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে নাস্তিকই ভাল লোক। সেই প্রত্যক্ষানুভূতির আলোকে আমি যে কয় পদ অগ্রসর হব, তা থেকে কোন কিছুই আমাকে কখনও হটাতে পারবে না। কোন দেশ যখন তুমি স্বয়ং গিয়ে দেখলে, তখনই তোমার তার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হল। আমাদের প্রত্যেককে নিজে নিজে দেখতে হবে। আচার্য্যেরা কেবল আমাদের কাছে খাবার এনে দিতে পারেন—ঐ খাদ্য থেকে পুষ্টিলাভ করতে গেলে আমাদের তা খেতে হবে। তর্কযুক্তিতে ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক প্রমাণ করতে পারে না, কেবল যুক্তিসঙ্গত একটা সিদ্ধান্তরূপে তাঁকে উপস্থাপিত করে।

ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা ঈশ্বর-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশমাত্র। আমরাই হচ্ছি ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায়, তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামান্য অনুকরণ মাত্র।

আমাদের মনের শক্তিগুলার একাগ্রতাই আমাদের ঈশ্বরদর্শনে সহায়তা করবার একমাত্র যন্ত্র। যদি তুমি একটি আত্মাকে (নিজ আত্মাকে) জানতে পার, তা হলে তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল আত্মাকেই জানতে পারবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনের একাগ্রতাসাধন হয়—আর বিচার, ভক্তি, প্রাণায়াম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তি উদ্বুদ্ধ ও বশীকৃত হতে পারে। একাগ্র মন যেন একটি প্রদীপ—এর দ্বারা আত্মার স্বরূপ তন্ন তন্ন করে দেখা যায়।

একপ্রকার সাধনপ্রণালী সকলের উপযোগী হতে পারে না। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন সাধনপ্রণালী যে সোপানের মত একটার

পর একটা অবলম্বন করতে হবে, তা নয়। ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানাদি সর্ব্বনিম্ন সাধন, তারপর ঈশ্বরকে আমাদের আত্মা থেকে বাইরে দেখা, তাবপর আমাদের আত্মার ভিতর ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করা। স্থলবিশেষে, একটার পর আব একটা—এইরূপ ক্রমের আবশ্যকতা হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথেরই আবশ্যক হয়ে থাকে। "জ্ঞানলাভ করতে হলে তোমাকে কর্ম্ম ও ভক্তির পথ দিয়ে প্রথমে যেতেই হবে"—সকলকেই এ কথা বলার চেয়ে আহাম্মকি আর কি হতে পারে?

যতদিন না যুক্তিবিচাবের অতীত কোন তত্ত্বলাভ করছ, ততদিন তুমি তোমার যুক্তিবিচার ধরে থাক, আর ঐ অবস্থায় পৌছুলে তুমি বুঝবে যে, এটা যুক্তিবিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস, কারণ উহা তোমার যুক্তির বিরোধী হবে না। এই যুক্তিবিচার বা জ্ঞানের অতীত ভূমি হচ্ছে সমাধি, কিন্তু স্নায়বীয় রোগের তাড়নায় মূর্চ্ছা-বিশেষকে সমাধি বলে ভুল করো না। অনেকে মিছামিছি সমাধি হয়েছে বলে দাবী করে থাকে, পশুর ন্যায় স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানকে সমাধি-অবস্থা ব'লে ভ্রম করে থাকে—এ বড় ভয়ানক কথা। যথার্থ ভাবসমাধি, না স্নায়বীয় রোগ তা বাইরে থেকে নির্ণয় করবাব কোন উপায় নেই—যথার্থ সমাধি-অবস্থা কি না, নিজে নিজেই তা টের পাওয়া যায়। তবে যুক্তিবিচারের সাহায্য নিলে ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেতে পারা যায়—সুতরাং একে ব্যতিবেকী পরীক্ষা বলা যেতে পারে; ধর্ম্মলাভ মানে হচ্ছে যুক্তিতর্কের বাইরে যাওয়া, কিন্তু ঐ ধর্ম্মলাভ করবার পথ একমাত্র যুক্তিবিচারেরই ভিতর দিয়ে। সহজাত জ্ঞান যেন বরফ, যুক্তিবিচার যেন জল, আর অলৌকিক জ্ঞান বা সমাধি

যেন বাষ্প—সব ,চেয়ে সূক্ষ্ম অবস্থা। একটার পর আর একটা আসে। সব জায়গায়ই এই নিত্য পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রম রয়েছে, যেমন অজ্ঞান, সংজ্ঞা বা আপেক্ষিক জ্ঞান ও বোধি; জড় পদার্থ, দেহ, মন। আর আমরা এই শৃঙ্খলের যে পাবটা (link) প্রথম ধরি সেইটা থেকেই শিকলটা আরম্ভ হয়েছে, আমাদের কাছে এই রকম বোধ হয়। অর্থাৎ কেউ বলে, দেহ থেকে মনের উৎপত্তি, কেউ বা মন থেকে দেহ হয়েছে বলে থাকে। উভয় পক্ষেই যুক্তির সমান মূল্য, আর উভয় মতই সত্য। আমাদের ঐ দুটোরই পারে যেতে হবে—এমন জায়গায় যেতে হবে, যেখানে দেহ মন এই দুই-ই নেই। এই যে ক্রম বা পৌর্ব্বাপর্য্য—এও মায়া।

ধর্ম্ম যুক্তিবিচারের পারে, ধর্ম্ম অতিপ্রাকৃতিক। বিশ্বাস-অর্থে কিছু মেনে লওয়া নয়—বিশ্বাসের অর্থ সেই চরম পদার্থকে ধারণা করা—এতে হৃদয়কন্দরকে উদ্ভাসিত করে দেয়। প্রথমে সেই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শোন, তারপর বিচার কর—বিচার দ্বারা উক্ত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কতদূর জানতে পারা যায় তা দেখ; এর উপর দিয়ে বিচারের বন্যা বয়ে যাক—তারপর বাকি যা থাকে সেইটাকে গ্রহণ কর। যদি কিছু বাকি না থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি একটা কুসংস্কার এড়ালে। আর যখন তুমি সিদ্ধান্ত করবে যে, কিছুতেই আত্মাকে উড়িয়ে দিতে পারে না, যখন আত্মা সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাক ও সকলকে ঐ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দাও; সত্য কখন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হ'তে পারে না তাতে সকলেরই কল্যাণ হবে। সবশেষে স্থিরভাবে ও শান্তচিত্তে তাঁর উপর নিদিধ্যাসন কর বা তাঁর ধ্যান কর, তোমার মনকে তাঁর উপর একাগ্র কর, ঐ আত্মার সহিত নিজেকে একভাবাপন্ন করে ফেলে। তখন আর বাক্যের কোন প্রয়োজন

থাকবে না, তোমার ঐ মৌনভাবই অপরের ভিতর সত্য তত্ত্ব সঞ্চার করবে। বৃথা বাক্যাড়ম্বরে শক্তিক্ষয় করো না, চুপচাপ করে ধ্যান কর। আর বহির্জ্জগতের গণ্ডগোল যেন তোমায় ব্যতিব্যস্ত না করে। যখন তোমার মন সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তুমি তা জানতে পার না। চুপচাপ করে থেকে শক্তিসঞ্চয় কর, আর আধ্যাত্মিকতার ডাইন্যামো (তড়িৎসঞ্চারক যন্ত্র) হয়ে যাও। ভিখারী আবার কি দিতে পারে? যে রাজা সেই কেবল দিতে পারে—সেও আবার কেবল তখনই দিতে পারে যখন সে নিজে কিছু চায় না।

* * *

তোমার যা টাকাকড়ি, তা তোমার নিজের মনে করো না, আপনাকে ভগবানের ভাণ্ডারী বলে মনে করো। তার প্রতি আসক্তি রেখো না। নামযশ, টাকাকড়ি সব যাক্, এ সব ত ভয়ানক বন্ধনস্বরূপ। স্বাধীনতার অপূর্ব্ব মুক্ত বায়ু সম্ভোগ কর। তুমি ত মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত; অবিরত বল আমি সদানন্দস্বভাব, আমি মুক্তস্বভাব, আমি অনন্ত-স্বরূপ, আমার আত্মাতে আদি-অন্ত নাই; সবই আমার আত্মাস্বরূপ।

২১শে জুলাই, রবিবার

(পাতঞ্জল যোগসূত্র)

চিত্ত বা মন যাতে বৃত্তিরূপে বিভক্ত না হয়ে পড়ে, যোগশাস্ত্র তাই শিক্ষা দিয়ে থাকে—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" মনটা বিষয়-সমূহের ছাপ ও অনুভূতির, অর্থাৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণস্বরূপ, সুতরাং তা নিত্য হতে পারে না। মনের একটা সূক্ষ্ম শরীর

আছে, সেই শরীরদ্বারা মন স্থূল দেহের উপর কার্য্য করে থাকে। বেদান্ত বলেন, মনের পশ্চাতে যথার্থ আত্মা আছেন। বেদান্ত অপর দুটিকে, অর্থাৎ দেহ-মনকে স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু আর একটি তৃতীয় পদার্থ স্বীকার করেন—যা অনন্ত, চরমতত্ত্বস্বরূপ, বিশ্লেষণের শেষ ফলস্বরূপ, এক অখণ্ড বস্তু—যাকে আর ভাগ করা যেতে পারে না। জন্ম হচ্ছে পুনর্যোজন, মৃত্যু হচ্ছে বিযোজন—আর সমুদয় বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে আত্মাকে পাওয়া যায়। আত্মাকে আর ভাগ করতে পারা যায় না, সুতরাং আত্মাতে পৌছুলে নিত্য সনাতন তত্ত্বে পৌছান গেল।

প্রত্যেক তরঙ্গের পশ্চাতে সমগ্র সমুদ্রটা রয়েছে—যত কিছু অভিব্যক্তি সমুদয়ই তরঙ্গ, তবে কতকগুলি খুব বড় আর কতকগুলি ছোট, এইমাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সব তরঙ্গগুলি স্বরূপতঃ সমুদ্র—সমুদয় সমুদ্রটাই; কিন্তু তরঙ্গহিসাবে প্রত্যেকটা এক একটা অংশ। তরঙ্গসমূহ যখন শান্ত হয়ে যায়, তখন সব এক। পতঞ্জলি বলেন—'দৃশ্যবিহীন দ্রষ্টা।' যখন মন ক্রিয়াশীল থাকে, তখন আত্মা তার সঙ্গে মিশিয়ে থাকেন। অনুভূত পুরাতন বিষয়গুলির দ্রুতবেগে পুনরাবৃত্তিকে স্মৃতি বলে।

অনাসক্ত হও। জ্ঞানই শক্তি—আর জ্ঞানলাভ করলেই তোমার শক্তিও আসবে। জ্ঞানের দ্বারা, এমন কি, এই জড় জগৎটাকেও তুমি উড়িয়ে দিতে পার। যখন তুমি মনে মনে কোন বস্তু থেকে এক একটা করে গুণ বাদ দিতে দিতে ক্রমে সব গুণগুলিই বাদ দিতে পারবে, তখন তুমি ইচ্ছা করলেই সমগ্র জিনিসটাকে তোমার জ্ঞান থেকে দূর করে দিতে পারবে।

যারা উত্তম অধিকারী তারা যোগে খুব শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করতে পারে—ছমাসে তারা যোগী হতে পারে। যারা তদপেক্ষা নিম্নাধিকারী তাদের যোগে সিদ্ধিলাভ করতে কয়েক বৎসর লাগতে পারে, আর যে কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সহিত সাধন করলে—অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল সদা সর্ব্বদা সাধনে রত থাকলে দ্বাদশ বর্ষে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। এই সব মানসিক ব্যায়াম না করে কেবল ভক্তিদ্বারাও ঐ অবস্থায় যেতে পারা যায়, কিন্তু তাতে কিছু বিলম্ব হয়। মনের দ্বারা সেই আত্মাকে যে ভাবে দেখা বা ধরা যেতে পারে, তাকেই ঈশ্বর বলে। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম ওঁ, সুতরাং ঐ ওঙ্কারজপ কর, তার ধ্যান কর, তার ভিতর যে অপূর্ব্ব অর্থসমূহ নিহিত রয়েছে, তা ভাবনা কর। সর্ব্বদা ওঙ্কার-জপই যথার্থ উপাসনা। ওঙ্কার সাধারণ শব্দ মাত্র নয়, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ।

ধর্ম্ম তোমায় নূতন কিছুই দেয় না, কেবল প্রতিবন্ধগুলি সরিয়ে দিয়ে তোমার নিজের স্বরূপ দেখতে দেয়। ব্যাধিই প্রথম মস্ত বিঘ্ন—সুস্থ শরীরই সেই যোগাবস্থা লাভ করবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রস্বরূপ। দৌর্ম্মনস্য বা মন খারাপ হওয়ারূপ বিঘ্নটিকে দূর করা একরূপ অসম্ভব বললেই হয়। তবে একবার যদি তুমি ব্রহ্মকে জানতে পার, পরে আর তোমার মন খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকবে না। সংশয়, অধ্যবসায়ের অভাব, ভ্রান্ত ধারণা—এগুলিও অন্যান্য বিঘ্ন।

* * *

প্রাণ হচ্ছে দেহস্থ অতি সূক্ষ্ম শক্তি—দেহের সর্ব্বপ্রকার গতির কারণস্বরূপ। প্রাণ সর্ব্বসুদ্ধ দশটি—তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান, আর

পাঁচটি অপ্রধান। একটি প্রধান প্রাণপ্রবাহ উপরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে, অপরগুলি নীচের দিকে। প্রাণায়াম অর্থ শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মনের দ্বারা প্রাণসমূহকে নিয়মিত করা। শ্বাস যেন কাষ্ঠস্বরূপ, প্রাণ বাষ্পস্বরূপ এবং শরীরটা যেন ইঞ্জিন। প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া আছে: পূরক—শ্বাসকে ভিতরে টানা, কুম্ভক—শ্বাসকে ভিতরে ধারণ করে রাখা, আর রেচক—বাইরে শ্বাসনিক্ষেপ করা।

* * *

গুরু হচ্ছেন সেই আধার, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি লোকের কাছে পৌঁছে থাকে। যে কেউ শিক্ষা দিতে পারে বটে, কিন্তু গুরুই শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন, তাই-তেই আধ্যাত্মিক উন্নতিরূপ ফল হয়ে থাকে। শিষ্যদের মধ্যে পরস্পর ভাই ভাই সম্বন্ধ, আর ভারতের আইন এই সম্বন্ধ স্বীকার করে থাকে। গুরু তাঁর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদের কাছ থেকে যে মন্ত্র বা ভাবশক্তিময় শব্দ পেয়েছেন, তাই শিষ্যে সংক্রমিত করেন—গুরু ব্যতীত সাধনভজন কিছু হতে পারে না। বরং বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ গুরুর সাহায্য না নিয়ে এই সকল যোগ অভ্যাস করতে গেলে কামের প্রাবল্য হয়ে থাকে, কিন্তু গুরুর সাহায্য থাকলে প্রায়ই এটা ঘটে না। প্রত্যেক ইষ্টদেবতার এক একটি মন্ত্র আছে। ইষ্ট অর্থে বিশেষ বিশেষ উপাসকের বিশেষ বিশেষ আদর্শকে বুঝিয়ে থাকে। মন্ত্র হচ্ছে ঐ ভাববিশেষব্যঞ্জক শব্দ। ঐ শব্দের ক্রমাগত জপের দ্বারা আদর্শটিকে মনে দৃঢ়ভাবে রাখবার সহায়তা হয়ে থাকে। এইরূপ উপাসনাপ্রণালী ভারতের সকল সাধকদের মধ্যে প্রচলিত।

২৩শে জুলাই, মঙ্গলবার

(ভগবদ্গীতা-- কর্ম্মযোগ)

কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে নিজেকে কর্ম্মে নিযুক্ত কর, কিন্তু কোন কামনা করো না—ফলাকাঙ্ক্ষা যেন তোমার না থাকে। এইরূপ কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে—ঐ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়। জ্ঞানলাভ করবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করলে তাতে দুঃখই এসে থাকে। আত্মার জন্য কর্ম্ম করলে তা থেকে কোন বন্ধন আসে না। কর্ম্ম থেকে সুখের আকাঙ্ক্ষাও করো না; আবার কর্ম্ম করলে কষ্ট হবে—এ ভয়ও করো না। দেহ-মনই কাজ করে থাকে, আমি করি না। সদাসর্ব্বদা আপনাকে এই কথা বল এবং এটি প্রত্যক্ষ করতে চেষ্টা কর। চেষ্টা কর, যেন তুমি কিছু করছ—এ জ্ঞানই তোমার না হয়।

সমুদয় কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ কর। সংসারে থাক, কিন্তু সংসারের হয়ে যেও না--পদ্মপত্রের মূল যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে কিন্তু তা যেমন সদাই শুদ্ধ থাকে, সেইরূপ লোকে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না, তোমার ভালবাসা যেন কারও প্রতি কম না হয়। অন্ধ যে তার বর্ণের জ্ঞান থাকতে পারে না--সুতরাং আমার নিজের ভিতর দোষ না থাকলে অপরের ভিতর দোষ দেখবো কি করে? আমরা আমাদের নিজেদের ভিতর যা রয়েছে, তার সঙ্গে বাইরে যা দেখতে পাই তার তুলনা করি এবং তদনুসারেই কোন বিষয়ে আমাদের মতামত দিয়ে থাকি। যদি আমরা নিজেরা পবিত্র হই, তবে বাইরে অপবিত্রতা দেখতে পাব না। বাইরে অপবিত্রতা

থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তার অস্তিত্ব থাকবে না। প্রত্যেক নরনারী, বালকবালিকার ভিতর ব্রহ্মকে দর্শন কর, অন্তর্জ্যোতিঃ দ্বারা তাঁকে দেখ; যদি সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মদর্শন হয়, তবে আমরা আর কিছু দেখতে পাব না। এই সংসারটাকে চেও না, কারণ যে যা চায় সে তাই পায়। ভগবানকে—কেবল ভনবানকেই অন্বেষণ কর। যত অধিক শক্তিলাভ হবে ততই বন্ধন আসবে, ততই ভয় আসবে। একটা সামান্য পিঁপড়ের চেয়ে আমরা কত অধিক ভীতু ও দুঃখী। এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের বাইরে ভগবানের কাছে যাও। স্রষ্টার তত্ত্ব জানবার চেষ্টা কর, সৃষ্টের তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করো না।

"আমিই কর্ত্তা ও আমিই কার্য্য।" "যিনি কামক্রোধের বেগধারণ করতে পারেন, তিনি মহাযোগী পুরুষ।"

"অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই কেবল মনকে নিরোধ করা যেতে পারে।"

* * *

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চুপচাপ করে বসে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করে গেছেন, আর আমাদেরও ঐ সব বিষয়ে খাটাবার জন্য মস্তিষ্ক রয়েছে। কিন্তু এখন আমরা টাকাকড়ির জন্য যে রকম ছুটোছুটি আরম্ভ করেছি, তাতে সেটা নষ্ট হবার যোগাড় হচ্ছে।

* * *

শরীরের নিজেরই নিজেকে আরোগ্য করবার একটা শক্তি আছে—আর মানসিক অবস্থা, ঔষধ, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয় এই আরোগ্য-শক্তিকে জাগিয়ে দিতে পারে। যত দিন আমরা ভৌতিক অবস্থাচক্রের

দ্বারা বিচলিত হই, ততদিন আমাদের জড়ের সহায়তার প্রয়োজন। আমরা যতদিন না স্নায়ুসমূহের দাসত্ব কাটাতে পাচ্ছি, ততদিন তাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।

আমাদের সাধারণ জ্ঞানভূমির নীচে মনের আর এক ভূমি আছে—তাকে অজ্ঞানভূমি বলা যেতে পারে; আমরা যাকে সমগ্র মানুষ বলি, জ্ঞান তার একটা অংশমাত্র। দর্শনশাস্ত্র মন সম্বন্ধে কতকগুলা আন্দাজ-মাত্র। ধর্ম্ম কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রত্যক্ষ দর্শন, যা জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি—তারই উপর প্রতিষ্ঠিত। মন যখন জ্ঞানেরও অতীত ভূমিতে চলে যায়, তখন সে যথার্থ বস্তু, যথার্থ বিষয়কেই উপলব্ধি করে। আপ্ত তাঁদের বলে, যাঁরা ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা যে উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই যে, তুমিও যদি তাঁদের প্রণালী অনুসরণ কর, তুমিও দেখবে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োজন। একজন জ্যোতিষী রান্নাঘরের সমস্ত হাঁড়িকুড়ির সাহায্য নিয়ে শনিগ্রহের বলয়গুলি দেখাতে পারে না—দেখাতে হলে দূরবীক্ষণযন্ত্রের দরকার। সেইরূপ ধর্ম্মের মহান সত্যসমূহ দেখতে হলে, যাঁরা পূর্ব্বেই সেগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের উপদিষ্ট প্রণালীগুলির অনুসরণ করতে হবে। যে বিজ্ঞান যত বড়, তার শিক্ষা করবার উপায়ও তত নানাবিধ। আমরা সংসারে আসবার পূর্ব্বেই ভগবান এ থেকে বেরুবার উপায়ও করে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের চাই শুধু সেই উপায়টাকে জানা। তবে বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে মারামারি করো না। কেবল যাতে তোমার অপরোক্ষানুভূতি হয় তার চেষ্টা কর, কেবল যাতে তোমার অপরোক্ষানুভূতি হয় তাই অবলম্বন কর, আর যে সাধনপ্রণালী তোমার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হয় তাই

অবলম্বন কর। তুমি আম খেয়ে যাও, অপরে ঝুড়িটা নিয়ে মারামারি করে মরুক। খৃষ্টকে দর্শন কর—তবেই তুমি যথার্থ খৃষ্টান হবে। আর সবই বাজে কথামাত্র—কথা যত কম হয় ততই ভাল।

যার জগতে কিছু বার্তা বহন করবার বা শিক্ষা দেবার থাকে, তাকেই বার্তাবহ বা দূত বলা যেতে পারে—দেবতা থাকলেই তবে তাকে মন্দির বলা যেতে পারে। এর বিপরীতটা সত্য নয়।

ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা কর, যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার মুখ ব্রহ্মবিদের মত প্রতিভাত হয়, যেমন সত্যকামের হয়েছিল।

আমারও আন্দাজী জ্ঞান, অপরেরও আন্দাজী জ্ঞান--কাজেই ঝগড়া বাধে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন করে তাবই সম্বন্ধে কথা কও দেখি—এমন মনুষ্যহৃদয় নেই, যা তাকে স্বীকার করতে বাধ্য না হয়। প্রত্যক্ষানুভূতি করাতেই সেন্ট পল্‌কে (St. Paul) ইচ্ছার বিরুদ্ধে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ঐ, অপরাহ্ণ (মধ্যাহ্নভোজনের পব অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়—সেই কথাবার্ত্তাপ্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন—)

ভ্রমই ভ্রমকে সৃষ্টি করে থাকে। ভ্রম নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করছে, আবার নিজেকেই নিজে নষ্ট করছে। একেই বলে মায়া। তথাকথিত সমুদয় জ্ঞানের ভিত্তিই মায়া। আবার এমন এক সময় আসে—যখন লোকে বুঝতে পারে যে, ঐ জ্ঞান অন্যোন্যাশ্রয়দোষদুষ্ট। তখন ঐ জ্ঞান নিজেই নিজেকে নষ্ট করতে চেষ্টা করে। 'ছেড়ে দাও রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।' ভ্রম কখনও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। যখনই আমরা সেই দড়িটাকে ধরি, মায়ার সহিত নিজেদের মিশিয়ে ফেলি, তখনই সে

আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে। মায়া যেখানে যাবার যাক তাকে ছেড়ে দাও, কেবল সাক্ষিস্বরূপ হয়ে থাক। তা হলেই অবিচলিত থেকে জগৎপ্রপঞ্চরূপ ছবির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হতে পারবে।

২৪শে জুলাই, বুধবার

যিনি যোগে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে যোগসিদ্ধিগুলি বিঘ্ন নয়, কিন্তু প্রবর্ত্তকের পক্ষে সেগুলি বিঘ্নস্বরূপ হতে পারে, কারণ ঐগুলি প্রয়োগ করতে করতে ঐ সবে একটা আনন্দ ও বিস্ময়ের ভাব আসতে পারে। সিদ্ধি বা বিভূতিগুলি যোগসাধনার পথে যে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যাচ্ছে তারই চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু সেগুলি মন্ত্রজপ, উপবাসাদি, তপস্যা, যোগসাধন, এমন কি, ঔষধ-বিশেষের ব্যবহারের দ্বারাও আসতে পারে। যে যোগী যোগসিদ্ধিসমূহেও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং সমুদয় কর্ম্মফল ত্যাগ করেন, তাঁর ধর্ম্মমেঘ নামে সমাধিলাভ হয়। যেমন মেঘ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তেমনি তিনি যে যোগাবস্থা লাভ করেন তাতে চারিদিকে ধর্ম্ম বা পবিত্রতার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

যখন একরূপ প্রত্যয়ের ক্রমাগত আবৃত্তি হতে থাকে, তখনই সেটা ধ্যানপদবাচ্য, কিন্তু সমাধি এক বস্তুতেই হয়ে থাকে।

মন আত্মার জ্ঞেয়, কিন্তু মন স্বপ্রকাশ নয়। আত্মা কোন বস্তুর কারণ হতে পারে না। কিরূপে হবে? পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হবে কিরূপে? পুরুষ প্রকৃতপক্ষে কখন প্রকৃতিতে যুক্ত হন না—অবিবেকের দরুণ পুরুষ প্রকৃতিতে যুক্ত হয়েছে বোধ হয়।

* * *

লোককে করুণার চক্ষে না দেখে, অথবা তারা অতি হীনদশায় পড়ে

আছে, এ রকম মনে না করে, অপরকে সাহায্য করতে শিক্ষা কর। শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতি সমদৃষ্টি হতে শিক্ষা কর; যখন তা হতে পারবে, আর যখন তোমার কোন বাসনা থাকবে না, তখন তোমার চরমাবস্থালাভ হয়েছে বুঝতে হবে।

বাসনারূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে অনাসক্তিরূপ কুঠার দ্বারা কেটে ফেল, তা হলেই তা একেবারে চলে যাবে—উহা ত একটা ভ্রমমাত্র। "যাঁর মোহ ও শোক চলে গেছে, যিনি সঙ্গদোষ জয় করেছেন, তিনি কেবল 'আজাদ' বা মুক্ত।"

কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে ভালবাসা হচ্ছে বন্ধন। সকলকে সমানভাবে ভালবাস—তা হলে সব বাসনা চলে যাবে।

সর্ব্বভক্ষক কাল এলে সকলকেই যেতে হবে। অতএব পৃথিবীর উন্নতির জন্য, ক্ষণস্থায়ী প্রজাপতিকে রঙচঙে করবার জন্য কেন চেষ্টা কর? সবই ত শেষে চলে যাবে। সাদা ইঁদুরের মত খাঁচায় বসে কেবল ডিগবাজি খেয়ো না, সদাই ব্যস্ত অথচ প্রকৃত কাজ কিছু হচ্ছে না। বাসনা ভালই হক, আর মন্দই হক, বাসনা জিনিসটাই খারাপ। এ যেন কুকুরের মত মাংসখণ্ড পাবার জন্য দিন-রাত লাফান অথচ মাংসের টুক্‌রোটা ক্রমাগত সাম্‌নে থেকে সরে যাচ্ছে, আর শেষে কুকুরের মত মৃত্যু। ও রকম হয়ো না। সমস্ত বাসনা নষ্ট করে ফেল।

* * *

পরমাত্মা যখন মায়াধীশ তখন তাঁকে বলে ঈশ্বর, আবার তিনি যখন মায়ার অধীন তখন তিনিই জীবাত্মাপদবাচ্য। সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চের সমষ্টিই মায়া, একদিন সেটা একেবারে উড়ে যাবে।

বৃক্ষের বৃক্ষত্বটা মায়া—গাছ দেখবার সময় আমরা প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-

স্বরূপকেই মায়াবৃতভাবে দেখছি। কোন ঘটনার সম্বন্ধে 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটাই মায়ার অন্তর্গত। সুতরাং মায়া কিরূপে এল, এ প্রশ্নটিই বৃথা প্রশ্ন, কারণ মায়ার মধ্যে থেকে ওর উত্তর কখন দেওয়া যেতে পারে না; আর যখন মায়ার পারে চলে যাবে, তখন কে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে? মন্দ বা মায়া বা অসদ্দৃষ্টিই 'কেন' এই প্রশ্নের সৃষ্টি করে কিন্তু 'কেন' প্রশ্ন থেকে মায়া আসে না—মায়াই ঐ 'কেন' জিজ্ঞাসা করে। ভ্রম ভ্রমকে নষ্ট করে দেয়। যুক্তিবিচার নিজেই একটা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এটা একটা বৃত্তস্বরূপ, কাজেই তাকে নিজেকে নিজে নষ্ট করতে হয়। ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি একটা আনুমানিক জ্ঞান, কিন্তু আবার সব আনুমানিক জ্ঞানের ভিত্তি অনুভূতি।

অজ্ঞানে যখন ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই তাকে দেখা যায়—স্বতন্ত্রভাবে ধরলে সেটা শূন্যস্বরূপ বৈ কিছুই নয়। মেঘে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত না হলে মেঘকে দেখাই যায় না।

চারজন লোক দেশভ্রমণ করতে করতে একটা খুব উঁচু দেয়ালের কাছে এসে উপস্থিত হল। প্রথম পথিকটি অতি কষ্টে দেয়াল বেয়ে উঠল, আর পেছন দিকে চেয়ে না দেখেই দেয়ালের ওপারে লাফ দিয়ে পড়ল। দ্বিতীয় পথিকটি দেয়ালে উঠল, ভিতরের দিকে দেখলে, আর আনন্দধ্বনি করে ভিতরে পড়ল। তারপর তৃতীয়টিও দেয়ালের মাথায় উঠল, তার সঙ্গীরা কোথায় গিয়েছে সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলে, তারপর আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে তাদের অনুসরণ করলে। কিন্তু চতুর্থ পথিকটি দেয়ালে উঠে তার সঙ্গীদের কি হল, লোককে জানাবার জন্য ফিরে এল। এই সংসার-প্রপঞ্চের বাইরে যে কিছু আছে, আমাদের কাছে তার প্রমাণ হচ্ছে—যে-সকল মহাপুরুষ মায়ার দেয়াল বেয়ে

ভিতরের দিকে পড়েছেন, তাঁরা পড়বার আগে যে আনন্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠেন, সেই হাস্য।

* * *

আমরা যখন সেই পূর্ণ সত্তা থেকে নিজেদের পৃথক্ করে তাতে কতকগুলি গুণের আরোপ করি, তখনই আমরা তাঁকে ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর হচ্ছেন—এই জগৎপ্রপঞ্চের মূল সত্য আমাদের মনের দ্বারা যেরূপভাবে দৃষ্ট হয়। আর সয়তান বলতে—জগতের সমুদয় মন্দ ও দুঃখরাশিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন যে ভাবে দেখে, তাই বুঝায়।

২৫শে জুলাই, বৃহস্পতিবার

(পাতঞ্জল যোগসূত্র)

কার্য্য তিন প্রকারের হতে পারে—কৃত (যা তুমি নিজে করছ), কারিত (যা অপরের দ্বারা করাচ্ছ), আর অনুমোদিত (অপরে করছে তাতে তোমার অনুমোদন আছে, কোন আপত্তি নেই)। আমাদের উপর এই তিন প্রকার কার্য্যের ফল প্রায় একরূপ।

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি খুব প্রবল হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে মৈথুনবর্জ্জিত হতে হবে। দেহটার যত্ন ভুলে যাও। যতটা পার, দেহজ্ঞান ছেড়ে দাও।

যে অবস্থায় স্থিরভাবে ও সুখে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যায়, তাকেই আসন বলে। সর্ব্বদা অভ্যাসের দ্বারা এবং মনকে অনন্তভাবে ভাবিত করতে পারলে এটি হতে পারে।

একটা বিষয়ে সর্ব্বদা চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান। স্থির জলে যদি একটা প্রস্তরখণ্ড ছুড়ে ফেলা যায়, তা হলে জলে অনেকগুলি

বৃত্তাকার তরঙ্গ উৎপন্ন হয়—বৃত্তগুলি সব পৃথক পৃথক অথচ পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করছে। আমাদের মনের ভিতরও এইরূপ বৃত্তিপ্রবাহ চলেছে; তবে আমাদের ভিতর সেটি অজ্ঞাতসারে হচ্ছে, আর যোগীদের ভিতর ঐরূপ কার্য্য তাঁদের জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। আমরা যেন মাকড়সার মত নিজের জালের মধ্যে রয়েছি, যোগ-অভ্যাসের দ্বারা আমরা মাকড়সার মত জালের যে অংশে ইচ্ছা যেতে পারি। যারা অযোগী তারা যেখানে রয়েছে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থলবিশেষে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়।

* * *

অপরকে হিংসা করলে তাতে বন্ধন আনে ও আমাদের সম্মুখ থেকে সত্যকে ঢেকে ফেলে। শুধু নিষেধাত্মক ধর্ম্মসাধনাই যথেষ্ট নয়। আমাদের মায়াকে জয় করতে হবে, তা হলেই মায়া আমাদের পেছনে ছুটবে। যখন কোন বস্তু আমাদের আর বাঁধতে না পারে, তখনই সেই বস্তু পাবার আমাদের যথার্থ অধিকার হয়। যখন ঠিক ঠিক বন্ধন ছুটে যায়, তখন সবই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হয়। যাদের কোন বস্তুর অভাব নেই, তারাই প্রকৃতিকে জয় করে থাকে।

এমন কোন মহাত্মার শরণাগত হও, যাঁর নিজের বন্ধন ছুটে গেছে, কালে তিনিই কৃপাবশে তোমায় মুক্ত করে দেবেন। ঈশ্বরের শরণাগতি এর চেয়ে উচ্চভাব, কিন্তু অতি কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এটি কার্য্যে পরিণত করতে পারে, এরূপ লোক এক শতাব্দীর ভিতর জোর একজন দেখা যায়। কিছু অনুভব করো না, কিছু জেনো না, কিছু করো না, কিছু নিজের বলে রেখো না—সমস্ত ঈশ্বরে সমর্পণ কর আর সর্ব্বান্তঃকরণে বল, 'প্রভো! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।'

আমরা বদ্ধ—এ ভাব আমাদের স্বপ্নমাত্র। জাগো—বন্ধনটা সব

চলে যাক। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, এই মায়া-মরু অতিক্রম করবার এই একমাত্র উপায়।

"শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ ;
নিজ হস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ।
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসি,
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

আমরা যে অপরের উপর দয়া প্রকাশ করতে পারছি, এ আমাদের একটা বিশেষ সৌভাগ্য—কারণ ঐরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমাদের আত্মোন্নতি হবে। লোকে যে কষ্ট পাচ্ছে, তার কারণ তার উপকার করে আমাদের কল্যাণ হবে। অতএব দাতা দান করবার সময় গ্রহীতার সামনে হাঁটুগেড়ে বসুন এবং নিজেকে ধন্য জ্ঞান করুন, গ্রহীতা সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেকে দানের অনুমতি করুন। সব প্রাণীর পশ্চাতে সেই প্রভুকে দর্শন করে তাঁকেই দান কর। যখন আমরা আর মন্দ কিছু দেখতে পাব না, তখন আমাদের পক্ষে জগৎপ্রপঞ্চই আর থাকবে না, কারণ প্রকৃতির অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদিগকে এই ভ্রম হতে মুক্ত করা। অসম্পূর্ণতা বলে কিছু আছে, এইটে ভাবাই অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করা। আমরা পূর্ণস্বরূপ ও ওজঃস্বরূপ, এই চিন্তাতেই কেবল এটা দূর হতে পারে। যতই ভাল কাজ কর না কেন, কিছু না কিছু মন্দ তাতে লেগে থাকবেই থাকবে। তবে সমুদয় কার্য্য নিজের ব্যক্তিগত ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে করে যাও, সব ফল ঈশ্বরে সমর্পণ কর, তা হলে ভাল-মন্দ কিছুই তোমায় অভিভূত করতে পারবে না।

কাজ করাটা ধর্ম্ম নয় বটে, তবে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করলে মুক্তির

দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে করুণার চক্ষে দেখা অজ্ঞানমাত্র, কারণ আমরা দুঃখিত হব কার জন্য? তুমি ঈশ্বরকে করুণার চক্ষে দেখতে পার কি? আর, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু আছে কি? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে তিনি তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্য এই জগৎরূপ নৈতিক ব্যায়ামশালা প্রদান করেছেন, কিন্তু কখনও ভেবো না—তুমি এই জগৎকে সাহায্য করতে পার। তোমায় যদি কেউ গাল দেয়, তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, কারণ গালাগালি বা অভিশাপ জিনিসটা কি তা দেখবার জন্য সে যেন তোমার সম্মুখে একখানি আরসি ধরছে, আর তোমাকে আত্মসংযম-অভ্যাস করবার অবসর দিচ্ছে। সুতরাং তাকে আশীর্ব্বাদ কর ও সুখী হও। অভ্যাস করবার অবকাশ না হলে শক্তির বিকাশ হতে পারে না, আর আরসি সামনে না ধরলে আমরা নিজের মুখ নিজে দেখতে পাই না।

অপবিত্র চিন্তা অপবিত্র ক্রিয়ার মতই দোষাবহ। কামেচ্ছাকে দমন করলে তা থেকে উচ্চতম ফললাভ হয়। কামশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর, কিন্তু নিজেকে পুরুষত্বহীন করো না, কারণ তাতে কেবল শক্তির অপচয় হবে মাত্র। এই শক্তিটা যত প্রবল থাকবে, এর দ্বারা তত অধিক কাজ হতে পারবে। প্রবল জলের স্রোত পেলেই তার সহায়তায় খনির কার্য্য করা যেতে পারে।

আজকাল আমাদের বিশেষ প্রয়োজন এই যে, আমাদের জানতে হবে, একজন ঈশ্বর আছেন, আর এখানে এবং এখনই আমরা তাঁকে অনুভব করতে—দেখতে পারি। চিকাগোর একজন অধ্যাপক বলেন, "এই জগতের তত্ত্বাবধান কর, ঈশ্বর পরলোকের খবর নেবেন।" কি আহাম্মকি কথা! যদি আমরা এই জগতের সব বন্দোবস্ত করতে সমর্থ

হই, তবে পরলোকের ভার নেবার জন্য আবার অকারণ একজন ঈশ্বরের কি দরকার?

২৬শে জুলাই, শুক্রবার

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)

সব বস্তুকে ভালবাস, কেবল আত্মার ভিতর দিয়ে এবং আত্মার জন্য। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলেছিলেন, "আত্মার দ্বারাই আমরা সব জিনিস জানতে পারছি।" আত্মা কখন জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না—যে নিজে জ্ঞাতা, সে কি করে জ্ঞেয় হবে? যিনি আপনাকে আত্মা বলে জানতে পারেন, তাঁর পক্ষে আর কোন বিধিনিষেধ থাকে না। তিনি জানতে পারেন, তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চস্বরূপ, আবার এর স্রষ্টাও বটে।

* * *

পুরাতন পৌরাণিক ব্যাপারগুলিকে রূপকের আকারে চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা করলে এবং তাদের নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে কুসংস্কারের উৎপত্তি হয়, আর এটা বাস্তবিক দুর্ব্বলতা। সত্যের সঙ্গে যেন কখন কিছুর আপোষ না করা হয়। সত্যের উপদেশ দাও, আর কোন প্রকার কুসংস্কারের যুক্তি দিতে চেষ্টা করো না, অথবা সত্যকে শিক্ষার্থীর ধারণাশক্তির উপযোগী করবার জন্য নাবিয়ে এনো না।

২৭শে জুলাই, শনিবার

(কঠোপনিষৎ)

অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কারও কাছে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা করতে যেও না। অপরের কাছে তা কেবল কথার কথামাত্র।

প্রত্যক্ষানুভূতি হলে মানুষ ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভূতভবিষ্যৎ, সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের পারে চলে যায়। নিষ্কাম ব্যক্তি সেই আত্মাকে দর্শন করেন, আর তাঁর আত্মার শাশ্বতী শান্তি এসে থাকে। মুখে বলা, বিচার, শাস্ত্রপাঠ ও বুদ্ধির চূড়ান্ত পরিচালনা করা, এমন কি, বেদ পর্য্যন্ত—এ সকল কোনটাই মানুষকে সেই আত্মজ্ঞান দিতে পারে না।

আমাদের ভিতর জীবাত্মা পরমাত্মা দুই-ই আছেন। জ্ঞানীরা জীবাত্মাকে ছায়াস্বরূপ, আর পরমাত্মাকে যথার্থ সূর্য্যস্বরূপ বলে জানেন।

আমরা যদি মনটাকে ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে সংযুক্ত না করি, তাহলে আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জ্ঞানই লাভ করতে পারি না। মন এই বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করে থাকে। ইন্দ্রিয়গুলিকে বাইরে যেতে দিও না—তা হলে দেহ এবং বহির্জ্জগৎ এই উভয়েরই হাত এড়াবে।

এই যে অজ্ঞাত বস্তুটাকে আমরা বহির্জ্জগৎ বলে দেখছি, মৃত্যুর পর নিজ নিজ মনের অবস্থানুসারে একেই কেহ স্বর্গ, কেহ বা নরক বলে দেখে। ইহলোক পরলোক—এ দুটোই স্বপ্নমাত্র, শেষোক্তটা আবার প্রথমটার ছাঁচে গড়া। ঐ দুই প্রকার স্বপ্ন থেকেই মুক্ত হও, জান—সবই সর্ব্বব্যাপী, সবই বর্ত্তমান। প্রকৃতি, দেহ ও মনেরই মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু হয় না; আমরা যাইও না, আসিও না। এই যে স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা রয়েছে—এর সত্তা প্রকৃতির ভিতর। সুতরাং এর জন্মও হয়েছে এবং মৃত্যুও হবে। কিন্তু আত্মা—যাঁকে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে দর্শন করছি—তাঁর কখন জন্ম হয় নি; তিনি কখনও মরবেন না—তিনি অনন্ত ও অপরিণামী সত্তা।

আমরা মনঃশক্তিকে পাঁচটা ইন্দ্রিয়শক্তিতেই ভাগ করি, অথবা একটা

শক্তিরূপে দেখি, মনঃশক্তি একরকমই থাকে। একজন অন্ধ বলে, 'প্রত্যেক জিনিসের এক এক বিভিন্ন প্রকার প্রতিধ্বনি আছে, সুতরাং আমি হাততালি দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের প্রতিধ্বনি দ্বারা আমার চতুর্দ্দিকে কোথায় কি আছে, ঠিক ঠিক বলতে পারি।' সুতরাং একজন অন্ধ একজন চক্ষুষ্মান্ লোককে ঘন কুয়াসার ভিতর দিয়ে অনায়াসে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পাবে। কারণ, তার কাছে কুয়াসা বা অন্ধকারে কিছু তফাৎ হয় না।

মনকে সংযত কর, ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরোধ কর, তা হলেই তুমি যোগী হলে; তারপর বাকি যা কিছু সবই হবে। শুনতে, দেখতে, ঘ্রাণ বা স্বাদ নিতে অস্বীকার কর; বহিরিন্দ্রিয়গুলি থেকে মনঃশক্তিকে সরিয়ে নাও। তুমি ত অজ্ঞাতসারে এটি সদাসর্ব্বদাই করছ—যেমন, যখন তোমার মন কোন বিষয়ে মগ্ন থাকে; সুতরাং তুমি অজ্ঞাতসারেও এটি করবার অভ্যাস করতে পার। মন যেখানে ইচ্ছা ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রয়োগ করতে পারে। আমাদের দেহের সাহায্যেই যে কাজ করতে হবে, এই মূল কুসংস্কারটি একেবারে ছেড়ে দাও। প্রকৃতপক্ষে ত তা নয়। নিজের ঘরে গিয়ে বস, আর নিজের অন্তরাত্মার ভিতর থেকে উপনিষদের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার কর। তুমি সকল বিষয়ের অনন্তখনিস্বরূপ, ভূত-ভবিষ্যৎ সকল গ্রন্থের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যতদিন না সেই ভিতরের অন্তর্য্যামী গুরুর প্রকাশ হচ্ছে, ততদিন বাহিরের উপদেশ সব বৃথা। বাহিরের শিক্ষাদ্বারা যদি হৃদয়স্বরূপ গ্রন্থ খুলে যায়, তবেই তার কিছু মূল্য আছে বলা যেতে পারে।

আমাদের ইচ্ছাশক্তিই সেই 'ক্ষুদ্র ধীর বাণী'; সেই যথার্থ নিয়ন্তা, যে আমাদিগকে সদা বিধিনিষেধ দিচ্ছে—বলছে এই কাজ কর, এই কাজ

করো না। এই ইচ্ছাশক্তি আমাদের যত বন্ধনের মধ্যে এনেছে। অজ্ঞ ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি তাকে বন্ধনে ফেলে, আর সেইটেই জ্ঞানপূর্ব্বক পরিচালিত হলে আমাদের মুক্তি দিতে পারে। সহস্র সহস্র উপায়ে ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা যেতে পারে, প্রত্যেক উপায়ই এক এক প্রকার যোগ; তবে প্রণালীবদ্ধ যোগের দ্বারা এটা খুব শীঘ্র সাধিত হতে পারে। ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগের দ্বারা খুব নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। মুক্তিলাভ করবার জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে সব প্রয়োগ কর; কর্ম্ম, বিচার, উপাসনা, ধ্যান—সমুদয় অবলম্বন কর, সব পাল এক সঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পুবাদমে চালাও, আর গন্তব্যস্থানে উপনীত হও। যত শীঘ্র পার, ততই ভাল।

* * *

খ্রীষ্টিয়ানদের ব্যাপ্টিজম্ (baptism) সংস্কার একটা বাহ্যশুদ্ধি-স্বরূপ—এটি অন্তঃশুদ্ধির প্রতীক বা সূচকস্বরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে এর উৎপত্তি।

খ্রীষ্টিয়ানদের ইউক্যারিষ্ট* নামক অনুষ্ঠান অসভ্য জাতিসমূহের একটি অতি প্রাচীন প্রথার অবশেষ বা চিহ্নমাত্র। ঐ-সব অসভ্য জাতি কখন কখন তাদের বড় বড় নেতারা যে সব গুণে মহৎ হয়েছেন, সেইগুলি পাবার আশায় তাঁদের মেরে ফেলত এবং তাঁদের মাংস খেত। তাদের বিশ্বাস ছিল, যে-সকল শক্তিতে তাদের নেতা বীর্য্যবান, সাহসী ও জ্ঞানী

---

* Eucharist of the Lord's Supper :—বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে লিখিত আছে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বে শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া রুটী ও মদ্য ঈশ্বরোদ্দেশে নিবেদন করিয়া বলেন, 'এই রুটী আমার মাংস এবং এই মদ্য আমার রক্ত।' তৎপরে শিষ্যগণকে উহা খাইতে বলেন। খ্রীষ্টানগণ এখনও ঐ দিনের সাম্বৎসরিক পালন করিয়া থাকেন ও উহাকে পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত করেন।

হয়েছিলেন, এই উপায়ে সেই শক্তিগুলি তাদের ভিতর আসবে, আর কেবল একব্যক্তি ঐরূপ বীর্য্যবান ও জ্ঞানী না হয়ে সমগ্র জাতিটাই ঐরূপ হবে। নরবলিপ্রথা য়াহুদীজাতির ভিতরও ছিল, আর তাঁদের ঈশ্বর জিহোবা ঐ প্রথার জন্য তাদের অনেক শাস্তি দিলেও, সেটা তাদের ভিতর থেকে একেবারে লোপ হয় নি। যীশু নিজে শান্তপ্রকৃতি ও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকে য়াহুদীজাতির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রচার করবার চেষ্টার ফলে খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এই মতবাতের উৎপত্তি হল যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিস্বরূপে নিজেকে বলি দিয়ে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করলেন। য়াহুদীদের মধ্যে পূর্ব্বে এক প্রথা ছিল—তাঁদের পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করে ছাগলের উপর মানুষের পাপ চাপিয়ে দিয়ে তাকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিতেন—এখানে ছাগলের বদলে মানুষ, এই তফাৎ। এই নিষ্ঠুর ভাব প্রবেশ করার দরুণ খ্রীষ্টধর্ম্ম খ্রীষ্টের যথার্থ শিক্ষা থেকে অনেক দূর তফাৎ হয়ে পড়ল এবং তার ভিতর পরের উপর অত্যাচার করবার ও অপরের রক্তপাত করবার ভাব এল।

* * *

কোন কাজ করবার সময় বলো না যে, 'এটা আমার কর্ত্তব্য', বরং বল 'এটা আমার স্বভাব'।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার হয় না। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, তা হলেই তুমি ভগবানকে লাভ করবে।

* * *

অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রাহ্মণজাতি নিজেদের সর্ব্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁরা নিজেদের ভূদেব বলে দাবি করেন। তাঁরা খুব দরিদ্রভাবে থাকেন, তবে তাঁদের দোষ এই

যে, তাঁরা আধিপত্য বা প্রভুত্ব খোঁজেন। যাই হ'ক, ভারতে প্রায় ৬ কোটী ব্রাহ্মণের বাস; তাঁদের কোনপ্রকার বিষয়-আশয় নেই, অথচ তাঁরা বেশ ভাল লোক, নীতিপরায়ণ। আর এইরূপ হবার কারণ এই যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁরা শিক্ষা পেয়ে আসছেন যে, তাঁরা বিধিনিষেধের অতীত, তাঁদের কোন প্রকার শাস্তির বিধান নেই। তাঁরা নিজেদের দ্বিজ বা ঈশ্বরতনয় জ্ঞান করে থাকেন।

২৮শে জুলাই, রবিবার

(দত্তাত্রেয়-কৃত অবধূত-গীতা)

"মনের স্থিরতার উপর সমুদয় জ্ঞান নির্ভর করছে।"

"যিনি সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চে পূর্ণভাবে বিরাজ করছেন, যিনি আত্মার মধ্যে আত্ম-স্বরূপ, তাঁকে আমি নমস্কার করি কিরূপে?"

"আত্মাকে আমার নিজের স্বভাব, নিজের স্বরূপ বলে জানাই পূর্ণজ্ঞান এবং প্রত্যক্ষানুভূতি। আমিই তিনি, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।"

"কোন চিন্তা, কোন বাক্য বা কোন কার্য্যই আমার বন্ধন উৎপাদন করতে পারে না। আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমি চিদানন্দস্বরূপ।"

অস্তি নাস্তি কিছুই নেই, সবই আত্ম-স্বরূপ। সমুদয় আপেক্ষিক ভাব, সমুদয় দ্বন্দ্ব দূর করে দাও, সব কুসংস্কার ঝেড়ে ফেল, জাতি কুল দেবতা আর যা কিছু, সব চলে যাক। থাকা, হওয়া—এ সবের কথা কেন বল? দ্বৈত অদ্বৈত এ সমুদয় কথা ছেড়ে দাও। তুমি দুই ছিলে কবে, যে দ্বৈত ও অদ্বৈতের কথা বলছ? এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ব্রহ্মমাত্র, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। যোগের দ্বারা বিশুদ্ধিলাভ হবে, একথা বলো না—তুমি স্বয়ং যে শুদ্ধ-স্বভাব। তোমায় কেউ শিক্ষা দিতে পারে না।

যিনি এই গীতা লিখেছেন, তাঁর মত লোকই ধর্মটাকে জীবন্ত রেখেছেন। তাঁরা বাস্তবিকই সেই ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেছেন। তাঁরা কোন কিছুর তোয়াক্কা রাখেন না, শরীরের সুখদুঃখ গ্রাহ্য করেন না, শীত-উষ্ণ বা বিপদাপদ বা অন্য কিছু মোটেই গ্রাহ্য করেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁদের দেহকে দগ্ধ করতে থাকলেও তাঁরা স্থির হয়ে বসে আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন, তাঁদের গা যে পুড়ছে তা তাঁরা টেরই পান না।

"জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-রূপ ত্রিবিধ বন্ধন যখন দূর হয়ে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।"

"যখন বন্ধন ও মুক্তিরূপ ভ্রম চলে যায়, তখনই আত্মস্বরূপের প্রকাশ হয়।"

"মনঃসংযম করে থাক তাতেই বা কি, না করে থাক তাতেই বা কি? তোমার অর্থ থাকে তাতেই বা কি, না থাকে তাতেই বা কি? তুমি নিত্যশুদ্ধ আত্মা। বল আমি আত্মা, কোন বন্ধন কখনও আমার কাছে ঘেঁসতে পারে নি। আমি অপরিণামী নির্মল আকাশস্বরূপ; নানাবিধ বিশ্বাস বা ধারণারূপ মেঘ আমার উপর দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে তারা স্পর্শই করতে পারে না।"

"ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য উভয়কেই দগ্ধ করে ফেল। মুক্তি ছেলেমানুষী কথামাত্র। আমি সেই অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ, আমি সেই শুদ্ধিস্বরূপ।"

"কেউ কখন বদ্ধ হয় নি, কেউ কখন মুক্তও হয় নি। আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি অনন্তস্বরূপ, নিত্যমুক্তস্বভাব। আমাকে

আর শেখাতে এসো না—আমি চিদ্‌ঘনস্বভাব, কিসে আমার এই স্বভাব বদলাতে পারে? গুরুই বা কে? শিষ্যই বা কে?"

তর্কযুক্তি, জ্ঞানবিচার ছুড়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দাও।

"বদ্ধস্বভাব লোকই অপরকে বদ্ধ দেখে, ভ্রান্ত ব্যক্তিই অপরকে ভ্রান্ত দেখে, অশুদ্ধস্বভাব লোকই অপরের অশুদ্ধ ভাব দেখে থাকে।"

দেশকালনিমিত্ত—এ সবই ভ্রম। তুমি যে মনে করছ তুমি বদ্ধ আছ, মুক্ত হবে—এটা তোমার রোগ। তুমি অপরিণামী। কথা বন্ধ কর, চুপ করে বসে থাক—সব জিনিস তোমার সামনে থেকে উড়ে যাক—ওগুলি স্বপ্নমাত্র। পার্থক্য বা ভেদ বলে কোন কিছু নেই, ওসব কুসংস্কারমাত্র। অতএব মৌনভাব অবলম্বন কর, আর নিজের স্বরূপ অবগত হও।

"আমি আনন্দঘনস্বরূপ।" কোন আদর্শের অনুসরণ করবার দরকার নেই—তুমি ছাড়া আর কি আছে? কিছুতে ভয় পেও না। তুমি সারসত্তাস্বরূপ। শান্তিতে থাক—নিজেকে চঞ্চল করো না। তুমি কখনও বদ্ধ হও নি। পুণ্য বা পাপ তোমাকে স্পর্শ করে নি। এই সমস্ত ভ্রম দূর করে দিয়ে শান্তিতে থাক। কাকে উপাসনা করবে? কেই বা উপাসনা করে? সবই ত আত্মা। কোন কথা কওয়া, কোনরূপ চিন্তা করাই কুসংস্কার। পুনঃ পুনঃ বল—'আমি আত্মা', 'আমি আত্মা'। আর সব উড়ে যাক।

২৯শে জুলাই, সোমবার, প্রাতঃকাল

আমরা কখন কখন কোন জিনিসের লক্ষণ করতে হলে তার আশপাশের কতকগুলি ব্যাপার বর্ণনা করে থাকি। একে তটস্থ

লক্ষণ বলে। আমরা যখন ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে আমরা তখন সেই অনির্ব্বাচ্য সর্ব্বাতীত সত্তারূপ সমুদ্রের কিনারার কিছু কিছু বর্ণনা করছি মাত্র। আমরা একে 'অস্তি'-স্বরূপ বলতে পারি না, কারণ অস্তি বলতে গেলেই তাঁর বিপরীত 'নাস্তি'র জ্ঞানও হয়ে থাকে, সুতরাং তাও আপেক্ষিক। তাঁর সম্বন্ধে কোন ধারণা, কোন প্রকার কল্পনা ঠিক ঠিক হতে পারে না। কেবল 'নেতি' 'নেতি'—এ নয়, ও নয় এই বলেই তাঁকে বর্ণনা করা যেতে পারে, কারণ তাঁকে চিন্তা করতে গেলেও সীমাবদ্ধ করতে হয়; সুতরাং সেটা আর ব্রহ্মের যথার্থ ভাব হল না।

ইন্দ্রিয়গুলো দিবারাত্র তোমায় ভুলজ্ঞান এনে দিয়ে প্রতারিত করছে। বেদান্ত অনেককাল পূর্ব্বেই এই বিষয় আবিষ্কার করেন। আধুনিক বিজ্ঞান সবেমাত্র ঐ তত্ত্বটি বুঝতে আরম্ভ করেছে। একখানা ছবির প্রকৃতপক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। কিন্তু চিত্রকর ছবিখানিতে কৃত্রিমভাবে গভীরতার ভাব ফলিয়ে প্রকৃতির প্রতারণার অনুকরণ করে থাকেন। দুজন লোক কখনও এক জগৎ দেখে না। চূড়ান্ত জ্ঞানলাভ হলে তুমি দেখতে পাবে—কোন বস্তুতে কোন প্রকার গতি, কোন প্রকার পরিণাম নেই। কোন প্রকার গতি বা পরিণাম আছে, আমাদের এই ধারণাই মায়া। সমুদয় প্রকৃতিটা অর্থাৎ সমুদয় গতির তত্ত্বটাকে সমষ্টিভাবে আলোচনা কর। দেহ ও মন কেহই আমাদের যথার্থ আত্মা নয়—উভয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত; কিন্তু কালে আমরা এদের ভিতরের সার সত্য—যথার্থ তত্ত্বকে জানতে পারি। তখন আমরা দেহ-মনের পারে চলে

যাই, সুতরাং দেহ-মনের দ্বারা যা কিছু অনুভব হয় তাও চলে যায়। যখন তুমি এই জগৎপ্রপঞ্চকে দেখতে পাবে না, বা জানতে পারবে না, তখনই তোমার আত্মোপলব্ধি হবে। আমাদের বাস্তবিক প্রয়োজন এই দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানকে অতিক্রম করা। অনন্ত মন বা অনন্ত জ্ঞান বলে কিছুই নেই, কারণ মন ও জ্ঞান উভয়ই সসীম। আমরা এক্ষণে আবরণের মধ্য দিয়ে দেখছি—তারপর ক্রমশঃ আবরণকে অতিক্রম করে আমরা আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সার-সত্যস্বরূপ সেই অজ্ঞাত বস্তুর কাছে পৌঁছুব।

যদি আমরা একটা কার্ডবোর্ডের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একখানা ছবি দেখি, তা হলে আমরা ঐ ছবির সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা লাভ করি, কিন্তু তথাপি আমরা যা দেখি তা বাস্তবিক ছবিটাই। ছিদ্রটা আমরা যত বাড়াতে থাকি, ততই আমরা ছবিটার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে থাকি। আমাদের নামরূপের ভ্রমাত্মক উপলব্ধি অনুসারে আমরা সত্য জিনিসটারই সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা করে থাকি। আবার যখন আমরা কার্ডবোর্ডখানা ফেলে দিই, আমরা সেই একই ছবি দেখে থাকি। কিন্তু ছবিটাকে ঠিক ঠিক দেখতে পাই। আমরা ঐ ছবিটাতে যত বিভিন্ন প্রকার গুণ বা ভ্রমাত্মক ধারণা আরোপ করি না কেন, ছবিটার তদ্দ্বারা কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। এইরূপ আত্মাই সকল বস্তুর মূল সত্যস্বরূপ —আমরা যা কিছু দেখছি সবই আত্মা, কিন্তু আমরা যে ভাবে এদের নামরূপাকারে দেখছি, সে ভাবে নয়। ঐ নামরূপ আবরণের অন্তর্গত—মায়ার অন্তর্গত।

ঐগুলি যেন দূরবীনের কাচের উপরের দাগ; আবার যেমন

সূর্য্যের আলোকের দ্বারাই আমরা ঐ দাগগুলি দেখতে পাই, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তু পশ্চাতে না থাকলে আমরা মায়াটাকেও দেখতে পেতাম না। স্বামী বিবেকানন্দ বলে মানুষটা ঐ দূরবীনের কাচের উপরকার দাগমাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমি সত্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, আর কেবল সেই সত্যবস্তুটাই আমাকে—স্বামী বিবেকানন্দকে—দেখতে সমর্থ করছে। সকল ভ্রমের মূলীভূত সার সত্তা আত্মা—আর যেমন সূর্য্য কখন ঐ কাচের উপরেব দাগগুলিব সঙ্গে মিশিয়ে যায় না, আমাদিগকে দাগগুলি দেখিয়ে দেয় মাত্র, সেইরূপ আত্মাও কখনও নামরূপের সঙ্গে মিশিয়ে যান না। আমাদের শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমূহ ঐ দাগগুলিকে যথাক্রমে কমায় বাড়ায় মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মনের দাগগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ফেল। তা হলেই আমরা দেখবো—'আমি ও আমার পিতা এক।'

আমরা আগে প্রত্যক্ষানুভূতি করি, যুক্তিবিচার পরে এসে থাকে। আমাদের এই প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করতে হবে, আর এই হ'ল বাস্তবিক ধর্ম্ম। কোন ব্যক্তি শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্ম্মমত বা অবতারের কথা না শুনে থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি প্রত্যক্ষানুভূতি করে থাকে, তার আর কিছুর দরকার নেই। চিত্ত শুদ্ধ কর—ধর্ম্মের এই হচ্ছে সার কথা; আর আমরা নিজেরা যতক্ষণ না মনের ঐ দাগগুলো দূর করছি, ততক্ষণ আমরা সেই সত্যস্বরূপকে ঠিক ঠিক দর্শন করতে পারি না। শিশু জগতের ভিতর কোন পাপ দেখতে পায় না, কারণ বাইরের পাপটার

পরিমাণ নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি তার নিজের ভিতর নেই। তোমার ভিতর যে দোষগুলি আছে, সব দূর করে ফেল—তা হলেই তুমি আর বাইরে কোন দোষ দেখতে পাবে না। ছোট ছেলের সামনে ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে, সে তা খেয়ালই করে না—এটা তার কাছে কিছু একটা অন্যায় বলে বোধ হয় না। ধাঁধার ছবির ভিতর লুকোনো জিনিসটা একবার যদি দেখতে পাও, তুমি পরে সর্ব্বদাই তা দেখতে পাবে। এইরূপে যখন তুমি একবার মুক্ত ও নির্দ্দোষ হয়ে যাবে, তখন জগৎপ্রপঞ্চের ভিতর তুমি মুক্তি ও শুদ্ধতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। সেই মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের গ্রন্থি সব ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁকাচোরা জায়গা সিধা হয়ে যায়, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ স্বপ্নের ন্যায় উড়ে যায়। আর ঘুম ভাঙ্গলেই আমরা এই সব বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম ভেবেই আশ্চর্য্য হই।

'যাঁকে লাভ করলে পর্ব্বতপ্রমাণ দুঃখও হৃদয়কে বিচলিত করতে পারে না,' তাঁকে লাভ করতে হবে।

জ্ঞানকুঠার দ্বারা দেহমনরূপ চক্রদ্বয়কে পৃথক করে ফেল, তা হলেই আত্মা মুক্তস্বরূপ হয়ে পৃথকভাবে দাঁড়াতে পারবে—যদিও পুরাতন বেগে তখনও দেহমনরূপ-চক্র খানিকক্ষণের জন্য চলবে। তবে তখন চাকাটি সোজাই চলবে, অর্থাৎ এই দেহমনের দ্বারা শুভ কার্য্যই হবে। যদি সেই শরীরের দ্বারা কিছু মন্দ কার্য্য হয়, তা হলে জেনো সে ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নয়—যদি সে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলে দাবি করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলছে। এটাও বুঝতে হবে যে, যখন চিত্তশুদ্ধির দ্বারা চক্রের বেশ সরল গতি এসে গেছে, সেই সময়ই তার উপর কুঠারপ্রয়োগ সম্ভব। সকল শুদ্ধিকর কর্ম্মই অজ্ঞানকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নষ্ট করছে। অপরকে পাপী বলার চেয়ে আর মন্দ কার্য্য কিছু নেই। ভাল কাজ না জেনে

করলেও তার ফল একই প্রকার হয়—তা বন্ধন-মোচনের সহায়তা করে।

দূরবীনের কাচের দাগগুলি দেখে সূর্য্যকেও দাগযুক্ত মনে করাই আমাদের মুখ্য ভ্রম। সেই 'আমি'-রূপ সূর্য্য কোন প্রকার বাহ্য-দোষে লিপ্ত নন—এইটি জেনে রাখ, আর নিজেকে ঐ দাগগুলি তুলতে নিযুক্ত কর। মানুষের চেয়ে বড় প্রাণী আর কেউ নেই। কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের ন্যায় মনুষ্যের উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তোমার যা কিছুর অভাব বোধ হয়, তাই তুমি সৃষ্টি করে থাক—বাসনামুক্ত হও। "বাসনায় জগৎ সৃজন, কর জীব বাসনা বর্জ্জন।"

* * *

দেবতারা ও পরলোকগত ব্যক্তিরা সকলে এখানেই রয়েছেন—এই জগৎকেই তাঁরা স্বর্গ-বলে দেখছেন। একই অজ্ঞাত বস্তুকে সকলে নিজ নিজ মনের ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছে। এই পৃথিবীতে কিন্তু ঐ অজ্ঞাত বস্তুর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দর্শনলাভ হতে পারে। কখনও স্বর্গে যাবার ইচ্ছা করো না—এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট ভ্রম। এই পৃথিবীতেও খুব বেশী পয়সা থাকা ও ঘোর দারিদ্র্য, উভয়ই বন্ধন—উভয়ই আমাদিগকে ধর্ম্মপথ থেকে, মুক্তি-পথ থেকে দূরে রাখে। তিনটি জিনিস এ পৃথিবীতে বড় দুর্লভ—প্রথম, মনুষ্যদেহ (মনুষ্যমনেই ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট প্রতিবিম্ব বিদ্যমান; বাইবেলে আছে, "মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ")। দ্বিতীয়, মুক্ত হবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয়, মহাপুরুষের আশ্রয়-লাভ—যিনি স্বয়ং মায়ামোহ-সমুদ্র পার হয়ে গেছেন, এমন মহাত্মাকে গুরুরূপে লাভ।†

† "দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।" —বিবেকচূড়ামণি, ৩

এই তিনটি যদি পেয়ে থাক, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, তুমি মুক্ত হবেই হবে।

কেবল তর্কযুক্তির দ্বারা তোমার যে সত্যের জ্ঞানলাভ হয়, তা একটা নূতন যুক্তিতর্কের দ্বারা উড়ে যেতে পারে, কিন্তু তুমি যা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনুভব কর, তা তোমার কোনকালে যাবার নয়। ধর্ম্মসম্বন্ধে কেবল বচনবাগীশ হলে কিছু ফল হয় না। যে কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসবে—যেমন মানুষ, জানোয়ার, আহার, কাজকর্ম্ম—সকলের পশ্চাতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর, আর এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি করাকে একটা অভ্যাসে পরিণত কর।

(আমেরিকার বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী) ইঙ্গারসোল আমায় একবার বলেন, "এই জগৎটা থেকে যতদূর লাভ করা যেতে পারে, তার চেষ্টা সকলের করা উচিত—এই আমার বিশ্বাস। কমলা লেবুটাকে নিংড়ে যতটা সম্ভব রস বার করে নিতে হবে, যেন এক ফোঁটা রসও বাদ না যায়; কারণ, আমরা এই জগৎ ছাড়া অপর কোন জগতের অস্তিত্বসম্বন্ধে সুনিশ্চিত নই।" আমি তাঁকে উত্তর দিয়েছিলাম—"আমি আপনার চেয়ে এই জগৎরূপ কমলালেবুটাকে নিংড়াবার উৎকৃষ্টতর প্রণালী জানি—আর আমি এ থেকে বেশী রস পেয়ে থাকি। আমি জানি আমার মৃত্যু নেই, সুতরাং আমার ঐ রস নিংড়ে নেবার তাড়া নেই। আমি জানি ভয়ের কোন কারণ নেই, সুতরাং বেশ করে ধীরে ধীরে আনন্দ করে নিংড়াচ্ছি। আমার কোন কর্ত্তব্য নেই, আমার স্ত্রীপুত্রাদি ও বিষয়সম্পত্তির কোন বন্ধন নেই, আমি সকল নরনারীকে ভালবাসতে পারি। সকলেই আমার পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ। মানুষকে ভগবান বলে ভালবাসলে কি আনন্দ—একবার ভেবে দেখুন দেখি! কমলালেবুটাকে এইভাবে নিংড়ান দেখি—অন্যভ

নিংড়ে যা রস পেতেন, তার চেয়ে দশ হাজার গুণ রস পাবেন—এক ফোঁটাও বাদ যাবে না।"

যাকে আমাদের 'ইচ্ছা' বলে মনে হচ্ছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরালস্থ আত্মা, এবং বাস্তবিকই মুক্তস্বভাব।

সোমবার, অপরাহ্ন

যীশুখ্রীষ্ট অসম্পূর্ণ ছিলেন, কারণ তিনি যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন, তদনুসারে সম্পূর্ণভাবে জীবনযাপন করেন নি, আর সর্বোপরি তিনি নারীগণকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নি। স্ত্রীলোকেরাই তাঁর জন্য সব করলে, কিন্তু তিনি য়াহুদীদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 'প্রেরিত শিষ্য' (Apostle) পদে উন্নীত করেন নি। তথাপি উচ্চতম চরিত্র হিসাবে বুদ্ধের পরেই তাঁর স্থান—আবার বুদ্ধও যে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিলেন, তাও নয়। যাই হ'ক, বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমাধিকার স্বীকার করেছিলেন, আর তাঁর নিজের স্ত্রীই তাঁর প্রথম ও একজন প্রধান শিষ্যা। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের অধিনায়িকা হয়েছিলেন। আমাদের কিন্তু এই সকল মহাপুরুষদের দোষানুসন্ধান করা উচিত নয়, আমাদের শুধু তাঁদের আমাদের চেয়ে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান করা উচিত। তা হলেও কিন্তু যিনি যত বড়ই হন না কেন, কোন মানুষকেই আমাদের শুধু বিশ্বাস করে পড়ে থাকলে চলবে না, আমাদেরও বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট হতে হবে।

কোন ব্যক্তিকেই তার দোষ বা অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার করা উচিত নয়। মানুষের যে মহা মহা সদ্গুণ দেখা যায়, তা তার নিজের, কিন্তু

তার দোষগুলি মনুষ্যজাতির সাধারণ দুর্ব্বলতা মাত্র; সুতরাং তার চরিত্র বিচার করতে গেলে সেগুলি কখন গণনা করতে নেই।

* * *

ইংরেজী ভার্চু (ধর্ম্ম) শব্দটি সংস্কৃত 'বীর' শব্দ থেকে এসেছে; কারণ প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদেরই লোকে শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক লোক বলে বিবেচনা করত।

৩০শে জুলাই, মঙ্গলবার

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ প্রভৃতি এঁরা কেবল বহিরবলম্বনস্বরূপ। আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে ঐ সকল আলম্বনে আমরা আরোপ করে থাকি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আমরাই আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকি।

যীশু যদি না জন্মাতেন, তবে মনুষ্যজাতির কখন উদ্ধার হত না—এরূপ ভাবা ঘোর নাস্তিকতা। মনুষ্যস্বভাবের ভিতর যে ঐশ্বরিক ভাব অন্তর্নিহিত রয়েছে, তাকে ঐরূপে ভুলে যাওয়া বড় ভয়ানক—ঐ ঐশ্বরিক ভাব কোন না কোন সময়ে প্রকাশ হবেই হবে। মনুষ্যস্বভাবের মহত্ত্ব কখনও ভুলো না। ভূত বা ভবিষ্যতে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আর কেউ হন নি, হবেনও না। আমিই সেই অনন্ত মহাসমুদ্র—খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণ তারই তরঙ্গমাত্র। তোমার নিজের পরমাত্মা ব্যতীত আর কারও কাছে মাথা নুইও না। যতক্ষণ না তুমি আপনাকে সেই দেবদেব বলে জানতে পারছ, ততক্ষণ তোমার কখন মুক্তি হতে পারে না।

আমাদের সকল অতীত কর্ম্মই বাস্তবিক ভাল, কারণ আমাদের যা চরমাবস্থা হবে, ঐ কর্ম্মগুলিই আমাদের সেইখানে নিয়ে যায়।

কার কাছে আমি ভিক্ষা করব?—আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র—তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে 'আমি' বলো না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে জেনো। সত্যকাম (অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য যাঁর প্রবল আকাজ্ক্ষা হয়েছে) শুনতে পেলেন—তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরীণ বাণী তাঁকে বলছে, "তুমি অনন্তস্বরূপ, সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে। নিজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শোন।"

যে-সকল মহাপুরুষ প্রচারকার্য্যের জন্য প্রাণপাত করে যান তাঁরা, যে-সকল মহাপুরুষ নির্জ্জনে নীরবে মহাপবিত্র জীবনযাপন করেন, বড় বড় ভাব চিন্তা করে যান ও ঐরূপে জগতের সাহায্য করেন, তাঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ। ঐ সকল শান্তিপ্রিয় নির্জ্জনবাসী মহাপুরুষের একের পর অপরের আবির্ভাব হয়—শেষে তাঁদের শক্তিরই চরমফলস্বরূপ এমন এক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি সেই তত্ত্বগুলি চারিদিকে প্রচার করে বেড়ান।

* * *

জ্ঞান স্বতঃই বর্ত্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল সেটা আবিষ্কার করে মাত্র। বেদসমূহই এই চিরন্তন জ্ঞান—যার সহায়তায় ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। ভারতের দার্শনিকগণ উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্ব বলে থাকেন, আর এই ভয়ানক দাবিও করে থাকেন।

* * *

সত্য যা, তা সাহসপূর্ব্বক নির্ভীকভাবে লোকের কাছে বল—ঐ

সত্যপ্রকাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হল বা না হল, সে দিকে খেয়াল করো না। সত্যের জ্যোতিঃ বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষেও যদি অতিমাত্রায় প্রখর বোধ হয়, তাঁরা যদি তা সহ্য করতে না পারেন, সত্যের বন্যায় যদি তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা যাক—যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল। ছেলেমানুষী ভাব সব শিশুদের ও বুনো অসভ্য-দেরই শোভা পায়; কিন্তু দেখা যায়, ঐ সব ভাব কেবল শিশুমহলে বা জঙ্গলেই আবদ্ধ নয়, ঐ সকল ভাবের অনেকগুলি ধর্ম্ম-প্রচারকের আসনেও উঠেছে।

বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হলে আর সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা অন্যায়। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে দেহপাত কর।

উন্নতি যা কিছু তা এই ব্যবহারিক বা আপেক্ষিক জগতেই হয়ে থাকে। মানবদেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই সর্ব্বোচ্চ প্রাণী, কারণ এই মানবদেহে এই জন্মেই আমরা এই আপেক্ষিক জগতের সম্পূর্ণরূপে বাইরে যেতে পারি, সত্যসত্যই মুক্তির অবস্থালাভ করতে পারি, আর ঐ মুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য। শুধু যে আমরা পারি তা নয়, অনেকে সত্যসত্যই ইহজীবনে মুক্তাবস্থা-লাভ করেছেন, পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছেন। সুতরাং কেউ এ দেহ ত্যাগ করে যতই সূক্ষ্ম—সূক্ষ্মতর দেহ লাভ করুক, সে তখনও এই আপেক্ষিক জগতের ভিতরই রয়েছে, সে আর আমাদের চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে না, কারণ মুক্তিলাভ করা ছাড়া আর কি উচ্চাবস্থা লাভ করা যেতে পারে।

দেবতারা (angels) কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন না,

তাঁরা কাজেই শান্তিও পান না; সুতরাং তাঁরা মুক্ত হতেও পারেন না। সংসারের ধাক্কাতেই আমাদের জাগিয়ে দেয়, তাইতেই এই জগৎস্বপ্ন ভাঙবার সাহায্য করে। ঐরূপ ক্রমাগত আঘাতই এই জগতের অসম্পূর্ণতা বুঝিয়ে দেয়, তাইতে আমাদের এ সংসার থেকে পালাবার—মুক্তিলাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।

* * *

কোন বস্তু যখন আমরা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি, তখন আমরা তার এক নাম দিই, আবার সেই জিনিসকেই যখন আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন অন্য নাম দিই। আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যত উন্নত হয়, আমাদের উপলব্ধিও তত উৎকৃষ্টতর হয়, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তত অধিক বলবতী হয়।

মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ

আমরা যে জড় ও চিন্তারাশির ভিতর সামঞ্জস্য দেখতে পাই, তার কারণ উভয়ই এক অজ্ঞাত বস্তুর দুটি দিকমাত্র, সেই জিনিসটাই দুভাগ হয়ে বাহ্য ও আন্তর হয়েছে।

ইংরেজী 'প্যারাডাইস' শব্দটি সংস্কৃত 'পরদেশ' শব্দ থেকে এসেছে, ঐ শব্দটা পারস্য ভাষায় চলে গিয়েছিল—এর শব্দার্থ হচ্ছে দেশের পারে, অথবা অন্য দেশ, বা অন্য লোক। প্রাচীন আর্য্যেরা বরাবরই আত্মায় বিশ্বাস করতেন, তাঁরা মানুষকে কেবল দেহমাত্র বলে কখনও ভাবতেন না। তাঁদের মতে স্বর্গ নরক উভয়ই সান্ত, কারণ কোন কার্য্যই কখনও তার কারণ-নাশের পর স্থায়ী হতে পারে না, আর কোন কারণই কখনও চিরস্থায়ী নয়; সুতরাং কার্য্য বা

ফলমাত্রের নাশ হবেই। নিম্নকথিত উপাখ্যানটিতে সমগ্র বেদান্ত-দর্শনের সার রয়েছে—

সোনার পাখাওয়ালা দুটি পাখী একটা গাছে বসে আছে। উপরে যে পাখীটা বসে আছে, সে স্থির শান্তভাবে নিজ মহিমায় নিজে বিভোর হয়ে রয়েছে; আর যে পাখীটা নীচের ডালে রয়েছে, সে সদাই চঞ্চল—ঐ গাছের ফল খাচ্ছে—কখনও মিষ্ট ফল, কখনও বা কটু ফল। একবার সে একটা অতিরিক্ত কটু ফল খেলে, তখন সে একটু স্থির হয়ে উপরের সেই মহিমময় পাখীটার দিকে চাইলে। কিন্তু আবার সে শীঘ্রই তাকে ভুলে গিয়ে পূর্ব্বের মত সেই গাছের ফল খেতে লাগল। আবার সে একটা কটু ফল খেলে—এইবার সে টুপ টুপ করে লাফিয়ে উপরের পাখীটার দু-এক ডাল কাছে গেল। এইরূপ অনেকবার হল, অবশেষে নীচের পাখীটা একেবারে উপরের পাখীটার জায়গায় গিয়ে বসল, আর নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সে অমনি বুঝলে যে, দুটো পাখী কোন কালেই ছিল না, সে নিজেই বরাবর শান্ত, স্থিরভাবে নিজ মহিমায় নিজে মগ্ন, উপরের পাখীই ছিল।

৩১শে জুলাই, বুধবার

প্রটেষ্টাণ্টধর্ম্ম-সংস্থাপক লুথার ধর্ম্মসাধনের ভিতর থেকে সন্ন্যাস বা ত্যাগ বাদ দিয়ে তার স্থানে কেবল নীতিমাত্র প্রচার করে ধর্ম্ম জিনিসটার সর্ব্বনাশ করে গেলেন। নাস্তিক ও জড়বাদীরাও নীতি-পরায়ণ হতে পারে, কেবল ঈশ্বরবিশ্বাসীরাই ধর্ম্মলাভ করতে পারে।

মহাপুরুষদের পবিত্রতার মূল্য, সমাজ যাদের অসৎ বলে থাকে,

তারা দিয়ে থাকে—সুতরাং তাদের দেখলে তাঁদের ঘৃণা না করে ঐ কথা ভাবা উচিত। যেমন গরীব লোকের পরিশ্রমের ফলে বড় লোকের বিলাসিতা সম্ভব হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও সেইরূপ। ভারতের সাধারণ লোকের যে এত অবনতি দেখা যায়, সেটা মীরাবাঈ বুদ্ধ প্রভৃতি মহাত্মাদের উৎপাদনের জন্য যেন প্রকৃতিকে তার মূল্য ধরে দিতে হয়েছে।†

* * *

"আমিই পবিত্রাত্মা বা ধার্ম্মিকদের পবিত্রতা বা ধর্ম্মস্বরূপ।" "আমিই সকলের মূল বা বীজস্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাকে বিভিন্ন-প্রকারে ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু সবই আমি।" "আমিই সব করছি, তুমি নিমিত্তমাত্র।"

বেশী বকো না, তোমার নিজের ভিতর যে আত্মা রয়েছেন তাঁকে অনুভব কর, তবেই তুমি জ্ঞানী হবে। এই হল জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। জানবার বস্তু একমাত্র ব্রহ্ম, তিনিই সব।

* * *

সত্ত্ব মানুষকে সুখ ও জ্ঞানের অন্বেষণে বদ্ধ করে, রজঃ বাসনা দ্বারা বদ্ধ করে, তমঃ ভ্রমজ্ঞান, আলস্য প্রভৃতি দ্বারা বদ্ধ করে। রজঃ,

---

† সমাজের আদর্শ অতি উচ্চ হইলে সকলে উহা পালন করিতে পারে না, কিন্তু এই অধিকাংশ লোক আদর্শ পালন করিতে গিয়া হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের সহায়তা ব্যতীত ঐ আদর্শটি বজায় থাকিতে পারে না। যেমন একশত সৈন্য শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে আশী জন মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অবশিষ্ট কুড়ি জন কৃতকার্য্য হইল। এখানে ঐ আশী জন সৈন্য ঐ যুদ্ধজয়ের মূল্য প্রদান করে নাই কি? সেইরূপ।

তমঃ এই দুটি নিকৃষ্ট গুণকে সত্ত্বের দ্বারা জয় কর, তারপর সমুদয় ঈশ্বরে সমর্পণ করে মুক্ত হও।

ভক্তিযোগী অতি শীঘ্র ব্রহ্মোপলব্ধি করেন ও তিন গুণের পারে চলে যান।

ইচ্ছা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়, বাসনা, রিপু—এইগুলি মিলে, আমরা যাকে জীবাত্মা বলে থাকি, তাই হয়েছে।

প্রথম, প্রাতিভাসিক আত্মা (দেহ); দ্বিতীয়, মানসাত্মা—যে দেহটাকে আমি বলে মনে করে; তৃতীয়, যথার্থ আত্মা, যিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। তাঁকে আংশিকভাবে দেখলে প্রকৃতি বলে বোধ হয়, আবার তাঁকেই পূর্ণভাবে দেখলে সমস্ত প্রকৃতি উড়ে যায়; এমন কি, তাঁর স্মৃতি পর্য্যন্ত লোপ হয়ে যায়। প্রথম—পরিণামী ও অনিত্য, দ্বিতীয়—প্রবাহরূপে নিত্য (প্রকৃতি), তৃতীয়—কূটস্থ নিত্য (আত্মা)।

* * *

আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর, এই হল সর্বোচ্চ অবস্থা। আশা করবার কি আছে? আশার বন্ধন ছিঁড়ে ফেল, নিজের আত্মার উপর দাঁড়াও, স্থির হও; যাই কর, সব ভগবানে অর্পণ কর, কিন্তু তার ভিতর কোন কপটতা রেখো না।

ভারতের কারও কুশল জিজ্ঞাসা করতে 'স্বস্থ' (যা থেকে 'স্বাস্থ্য' কথাটা এসেছে) এই সংস্কৃত শব্দটার ব্যবহার হয়ে থাকে। স্বস্থ শব্দের অর্থ—স্ব অর্থাৎ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। হিন্দুরা কোন জিনিস দেখেছে, এইটা বুঝাতে হ'লে বলে থাকে, 'আমি একটা পদার্থ দেখেছি।' 'পদার্থ' কি না পদ বা শব্দের অর্থ, অর্থাৎ শব্দপ্রতিপাদ্য

ভাববিশেষ। এমন কি, এই জগৎপ্রপঞ্চটা তাদের কাছে একটা 'পদার্থ' (অর্থাৎ পদের অর্থ)।

* * *

জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ আপনা আপনি শুভ কার্য্যই করে থাকে। সেটা কেবল শুভ কার্য্যই করতে পারে, কারণ তা সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। যে অতীত সংস্কাররূপ বেগের দ্বারা তাঁদের দেহচক্র পরিচালিত হতে থাকে, তা সব শুভ সংস্কার। মন্দ সংস্কার সব দগ্ধ হয়ে গেছে।

* * *

"যদচ্যুত-কথালাপ-রস-পীযূষ-বর্জ্জিতম্।
তদ্দিনং দুর্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দিনম্॥"

—'সেই দিনকেই যথার্থ দুর্দ্দিন বলা যায়, যে দিন আমরা ভগবৎ-প্রসঙ্গ না করি;' কিন্তু যে দিন মেঘ ঝড় বৃষ্টি হয়, সে দিনকে প্রকৃতপক্ষে দুর্দ্দিন বলা যায় না।'

সেই পরম প্রভুর প্রতি ভালবাসাকে যথার্থ ভক্তি বলা যায়। অন্য কোন পুরুষের প্রতি ভালবাসাকে, তিনি যত বড়ই হন না কেন, ভক্তি বলা যায় না। এখানে পরম প্রভু বলতে পরমেশ্বরকে বুঝাচ্ছে। তোমরা পাশ্চাত্য দেশে ব্যক্তিস্বরূপ-ঈশ্বর (Personal God) বলতে যা বোঝ ভারতে পরমেশ্বরের ধারণা তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। "যাঁ হতে এই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হচ্ছে, যাঁতে এটা স্থির রয়েছে আবার প্রলয়কালে যাঁতে লয় হয়, তিনিই ঈশ্বর—নিত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বশক্তিমান্, সদামুক্তস্বভাব, দয়াময়, সর্ব্বজ্ঞ, সকল গুরুর গুরু, অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ।"

মানুষ নিজের মস্তিষ্ক থেকে ভগবানকে সৃষ্টি করে না; তবে তার যতদূর শক্তি সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পারে, আর তার যত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধারণা তাঁতে আরোপ করে। এই এক একটি গুণই ঈশ্বরের সবটাই, আর এই এক একটি গুণের দ্বারা সবটাকে বোঝানই বাস্তবিক ব্যক্তিস্বরূপ-ঈশ্বরের (Personal God) দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঈশ্বর নিরাকার, অথচ তাঁর সব আকার রয়েছে, তিনি নির্গুণ আবার তাঁতে সব গুণ রয়েছে। আমরা যতক্ষণ মানবভাবাপন্ন রয়েছি, ততক্ষণ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও জীব—এই তিনটি সত্তা আমাদের দেখতে হয়। তা না দেখে থাকতেই পরি না।

কিন্তু ভক্তের পক্ষে এই সকল দার্শনিক পার্থক্য কেবল বাজে কথা মাত্র। সে যুক্তি-বিচার মোটে গ্রাহ্যই করে না, সে বিচার করে না—সে দেখে, প্রত্যক্ষ অনুভব করে। সে ঈশ্বরের শুদ্ধ প্রেমে আত্মহারা হয়ে যেতে চায়; আর এমন অনেক ভক্ত হয়ে গেছেন, যাঁরা বলেন মুক্তির চেয়ে ঐ অবস্থাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। যাঁরা বলেন, "চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি"—আমি সেই প্রেমাস্পদকে ভালবাসতে চাই, তাঁকে সম্ভোগ করতে চাই।

ভক্তিযোগে প্রথম বিশেষ প্রয়োজন এই যে, অকপটভাবে ও প্রবল-ভাবে ঈশ্বরের অভাব বোধ করা। আমরা ঈশ্বর ছাড়া আর সবই চাই, কারণ বহির্জ্জগৎ থেকেই আমাদের সব বাসনা পূরণ হয়ে থাকে। যতদিন আমাদের প্রয়োজন বা অভাববোধ জড়জগতের ভিতরই সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমরা ঈশ্বরের জন্য কোন অভাব-বোধ করি না; কিন্তু যখন আমরা এ জীবনে চারদিক থেকে প্রবল ঘা খেতে থাকি, আর ইহজগতের সকল বিষয়েই নিরাশ হই, তখনই

উচ্চতর কোন বস্তুর জন্য আমাদের প্রয়োজনবোধ হয়ে থাকে, তখনই আমরা ঈশ্বরের অন্বেষণ করে থাকি।

ভক্তি আমাদের কোন বৃত্তিকে ভেঙ্গেচুরে দেয় না, বরং ভক্তিযোগের শিক্ষা এই যে, আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মুক্তিলাভ করবার উপায়-স্বরূপ হতে পারে। ঐ সব বৃত্তিগুলিকেই ঈশ্বরাভিমুখী করতে হবে—সাধারণতঃ যে ভালবাসা অনিত্য ইন্দ্রিয়বিষয়ে নষ্ট করা হয়ে থাকে, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে দিতে হবে।

তোমাদের পাশ্চাত্ত্য ধর্মের ধারণা হতে ভক্তির এইটুকু তফাৎ যে, ভক্তিতে ভয়ের স্থান নাই—ভক্তি দ্বারা কোন পুরুষের ক্রোধ শান্ত করতে বা কাউকে সন্তুষ্ট করতে হবে না। এমন কি, এমন সব ভক্তও আছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে তাঁদের নিজের ছেলে বলে উপাসনা করে থাকেন—এরূপ উপাসনার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ উপাসনায় ভয় বা ভয়মিশ্র ভক্তির কোন ভাব না থাকে। প্রকৃত ভালবাসায় ভয় থাকতে পারে না, আর যতদিন পর্য্যন্ত এতটুকু ভয় থাকবে, ততদিন ভক্তির আরম্ভই হতে পারে না। আবার ভক্তিতে ভগবানের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার, অথবা তাঁর সঙ্গে কেনাবেচার ভাব কিছু নাই। ভগবানের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা ভক্তের দৃষ্টিতে মহা অপরাধ। ভক্ত কখনও ভগবানের নিকট আরোগ্য বা ঐশ্বর্য্য, এমন কি স্বর্গ পর্য্যন্ত কামনা করেন না।

যিনি ভগবানকে ভালবাসতে চান, ভক্ত হতে চান, তাঁকে ঐ সব বাসনাগুলি একটি পুঁটুলি করে দরজার বাইরে ফেলে দিয়ে ঢুকতে হবে। যিনি সেই জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাঁকে এর দরজায় ঢুকতে গেলে আগে দোকানদারী-ধর্মের পুঁটুলি

বাইরে ফেলে আসতে হবে। এ কথা বলছি না যে, ভগবানের কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না—সবই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐরূপ প্রার্থনা করা অতি নীচু দরের ধর্ম্ম, ভিখারীর ধর্ম্ম।

'উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।'

—সে ব্যক্তি বাস্তবিকই মূর্খ, যে গঙ্গাতীরে বাস ক'রে জলের জন্য কূয়া খোঁড়ে।

এই সব আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ঐহিক অভ্যুদয়ের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা যায় না—এগুলি অতি নীচু দরের কর্ম্ম। ভক্তি এর চেয়ে উঁচু জিনিস। আমরা রাজরাজের সামনে আসবার চেষ্টা করছি। আমরা সেখানে ভিখারীর বেশে যেতে পারি না। যদি আমরা কোন মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হতে ইচ্ছা করি, ভিখারীর মত ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে গেলে সেথায় কি ঢুকতে দেবে? কখনই নয়। দরওয়ান আমাদের ফটক থেকে বার করে দেবে। ভগবান রাজার রাজা—আমরা তাঁর সামনে কখনও ভিক্ষুকের বেশে যেতে পারি না। দোকানদারদের তথায় প্রবেশাধিকার নেই—সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলবে না। তোমরা বাইবেলেও পড়েছ, যীশু ক্রেতাবিক্রেতাদের মন্দির থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হবার জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে, স্বর্গাদির কামনা একেবারে দূর করে দেওয়া। এরূপ স্বর্গ এই জায়গারই, এই পৃথিবীরই মত—না হয় এর চেয়ে একটু ভাল। খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গের ধারণা এই যে, সেটা একটা খুব বেশী ভোগের স্থানমাত্র—সেটা কি করে ভগবান হতে পারে? এই যে সব স্বর্গে যাবার বাসনা—এ ভোগসুখেরই কামনা। এ বাসনা ত্যাগ করতে হবে।

ভক্তের ভালবাসা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হওয়া চাই—নিজের জন্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করা হবে না।

সুখদুঃখ, লাভক্ষতি—এ সকলের গণনা ত্যাগ ক'রে দিবারাত্রি ঈশ্বরোপাসনা কর—এক মুহূর্ত্তও যেন বৃথা নষ্ট না হয়।

আর সব চিন্তা ত্যাগ করে দিবারাত্রি সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের উপাসনা কর।

এইরূপে দিবারাত্রি উপাসিত হলে তিনি নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাঁর উপাসকদিগকে তাঁর অনুভবে সমর্থ করেন।

১লা আগষ্ট, বৃহস্পতিবার

প্রকৃত গুরু তিনি, যিনি আমাদের আধ্যাত্মিক পূর্ব্বপুরুষ – আমরা যাঁর ভিতরের আধ্যাত্মিকতার উত্তরাধিকারী। তিনিই সেই প্রণালী, যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রবাহ আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। তিনিই সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগসূত্রস্বরূপ। ব্যক্তিবিশেষের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস থেকে দুর্ব্বলতা ও অন্তঃসারশূন্য বহিঃপূজা আসতে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি প্রবল অনুরাগে খুব দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়, তিনি আমাদের ভিতরের গুরুর সঙ্গে আমাদের সংযোগবিধান করেন। যদি তোমার গুরুর ভিতর যথার্থ সত্য থাকে, তবে তাঁর আরাধনা কর, ঐ গুরুভক্তিই তোমাকে অতি সত্বর চরম অবস্থায় নিয়ে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুর ন্যায় পবিত্রস্বভাব ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও টাকা ছোঁন নাই, আর তাঁর ভিতরে কাম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যদের কাছে জড়বিজ্ঞান শিখতে যেও না,

তাঁদের সমগ্র শক্তি আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভিতর মানুষভাবটা মরে গিছল, কেবল ঈশ্বরত্ব অবশিষ্ট ছিল। তিনি বাস্তবিকই পাপ দেখতে পেতেন না—তিনি সত্যসত্যই যে চক্ষে বহির্জ্জগতে পাপদর্শন হয়, তার চেয়ে পবিত্রতর দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। এইরূপ অল্প কয়েকজন পরমহংসের পবিত্রতাই সমগ্র জগৎটাকে ধারণ করে রেখেছে। যদি এঁরা সকলেই মারা যান, সকলেই যদি জগৎটাকে ত্যাগ করে যান, তবে জগৎ খণ্ড খণ্ড হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁরা কেবল নিজে মহোচ্চ পবিত্র জীবন যাপন ক'রে লোকের কল্যাণবিধান করেন, কিন্তু তাঁরা যে অপরের কল্যাণ করছেন, তা তাঁরা টেরও পান না; তাঁরা নিজেরা আদর্শ জীবনযাপন করেই সন্তুষ্ট থাকেন।

* * *

আমাদের ভিতরে যে জ্ঞানজ্যোতিঃ বর্ত্তমান রয়েছে, শাস্ত্র তার আভাস দিয়ে থাকে, আর তাকে অভিব্যক্ত করবার উপায় বলে দেয়, কিন্তু যখন আমরা নিজেরা সেই জ্ঞানলাভ করি, তখনই আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্র বুঝতে পারি। যখন তোমার ভিতর সেই অন্তর্জ্যোতির প্রকাশ হয়, তখন আর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন?—তখন কেবল অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত কর। সমুদয় শাস্ত্রে যা আছে, তোমার নিজের মধ্যেই তা আছে, বরং তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী আছে। নিজের উপর বিশ্বাস কখনও হারিও না, এ জগতে তুমি সব করতে পার। কখনও নিজেকে দুর্ব্বল ভেবো না, সব শক্তি তোমার ভিতর রয়েছে।

প্রকৃত ধর্ম্ম যদি শাস্ত্রের উপর বা কোন মহাপুরুষের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, তবে চুলোয় যাক সব ধর্ম্ম, চুলোয় যাক সব শাস্ত্র।

ধর্ম্ম আমাদের নিজেদের ভিতর রয়েছে। কোন শাস্ত্র বা কোন গুরু আমাদের তাঁকে লাভ করবার সাহায্য ভিন্ন আর কিছু করতে পারেন না; এমন কি এঁদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের নিজেদের ভিতরেই সব সত্য লাভ করতে পারি। তথাপি শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হও, কিন্তু এঁরা যেন তোমায় বদ্ধ না করেন; তোমার গুরুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা কর, কিন্তু অন্ধভাবে তাঁর অনুসরণ করো না। তাঁকে যতদূর সম্ভব ভালবাস, কিন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা কর। কোনরূপ অন্ধবিশ্বাস তোমায় মুক্তি দিতে পারে না, তুমি নিজেই নিজের মুক্তিসাধন কর। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই একমাত্র ধারণা রাখ যে, তিনি আমাদের নিত্য সহায়।

স্বাধীনতার ভাব এবং উচ্চতম প্রেম—দু-ইই একসঙ্গে থাকা চাই, তা হলে এদের মধ্যে কোনটাই আমাদের বন্ধনের কারণ হতে পারে না। আমরা ভগবানকে কিছু দিতে পারি না, তিনিই আমাদের সব দিয়ে থাকেন। তিনি সকল গুরুর গুরু। তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, আমাদের যা যথার্থ স্বরূপ, তাই তিনি। যখন তিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা, তখন আমরা যে তাকে ভালবাসব, এ আর আশ্চর্য্য কি? আর কাকে বা কোন্ বস্তুকে আমরা ভালবাসতে পারি? আমাদের 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্' হওয়া চাই। যখন তোমরা কেবল ব্রহ্মকেই দেখবে, তখন আর কার উপকার করতে পারবে? ভগবানের ত আর উপকার করতে পার না? তখন সব সংশয় চলে যায়, সর্ব্বত্র সমত্বভাব এসে যায়। যদি তখন কারও কল্যাণ কর ত নিজেরই কল্যাণ করবে। এইটি অনুভব কর যে, দানগ্রহীতা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি যে তার সেবা করছ তার কারণ—তুমি তার চেয়ে ছোট; এ নয় যে, তুমি

বড়, আর সে ছোট। গোলাপ যেমন নিজের স্বভাবেই সুগন্ধ বিতরণ করে, আর সুগন্ধ দিচ্ছে বলে সে মোটেই টের পায় না, তুমিও সেই ভাবে দান কর।

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় এইরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটা ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহপ্রথা বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কারকার্য্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দ্বারা সাধিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায়ই এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য্য হন। যত দিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরেজেরা কিছুই করে নি। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজ নামে বিখ্যাত ধর্ম্মসমাজও স্থাপন করেন, আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি তারপর সরে এলেন এবং বললেন, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজেরা এগিয়ে যাও।' তিনি নামযশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করতেন না।

বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ

জগৎপ্রপঞ্চ অনন্তভাবে অভিব্যক্ত হয়ে ক্রমাগত চলেছে, যেন নাগরদোলা—আত্মা যেন ঐ নাগরদোলায় চড়ে ঘুরছে। এক একজন লোক ঐ নাগরদোলা থেকে নেমে পড়ছে বটে, কিন্তু নাগরদোলার ঘোরবার বিরাম নেই, সেই একরকম ঘটনাই পুনঃ পুনঃ হচ্ছে, আর এই কারণেই লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দেওয়া যেতে পারে; কারণ প্রকৃতপক্ষে সবই বর্ত্তমান। যখন আত্মা একটা শৃঙ্খলের ভিতর

এসে পড়ে, তখন তাকে সেই শৃঙ্খলের যা কিছু অনুভব বা ভোগ —সবই গ্রহণ করতে হয়। ঐরূপ একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণী থেকে আত্মা আর একটা শৃঙ্খল বা শ্রেণীতে চলে যায়, আর কোন কোন শ্রেণীতে এলে তারা আপনাদের ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব ক'রে একেবারে তা থেকে বেরিয়ে যায়। ঐরূপ শ্রেণীর বা শৃঙ্খলবিশেষের একটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে সমুদয় শৃঙ্খলটাকেই টেনে আনা যেতে পারে, আর তার ভিতরের সমুদয় ঘটনাটাই যথাযথ পাঠ করা যেতে পারে। এই শক্তি সহজেই লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু এতে বাস্তবিক কোন লাভ নেই, আর যত ঐ শক্তিলাভের চেষ্টা করা যায়, ততই আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার হানি হয়। স্থতরাং ওসব বিষয়ের চেষ্টা করো না, ভগবানের উপাসনা কর।

২রা আগষ্ট, শুক্রবার

ভগবৎসাক্ষাৎকার করতে গেলে প্রথমে নিষ্ঠার দরকার।

'সব্‌সে রসিয়ে সব্‌সে বসিয়ে সব্‌কা লীজিয়ে নাম।
হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম॥'

—সকলের সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের সঙ্গে বস, সকলের নাম লও, অপরের কথায় হাঁ হাঁ করতে থাক, কিন্তু আপন ভাব কোন মতে ছেড়ো না। এর চেয়ে উচ্চতর অবস্থা—অপরের ভাবে নিজেকে যথার্থ ভাবিত করা। যদি আমিই সব হই, তবে আমার ভাইয়ের সঙ্গে যথার্থভাবে এবং কার্য্যতঃ সহানুভূতি করতে পারব না কেন? যতক্ষণ আমি দুর্ব্বল, ততক্ষণ আমাকে নিষ্ঠা করে একটা রাস্তা ধরে থাকতে হবে; কিন্তু যখন

আমি সবল হব, তখন আমি অপর সকলের মত অনুভব করতে পারব, তাদের সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি করতে পারব।

প্রাচীন কালের লোকের ভাব ছিল—'অপর সকল ভাব নষ্ট করে একটা ভাবকে প্রবল কর।' আধুনিক ভাব হচ্ছে—'সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি কর।' একটা তৃতীয় পন্থা হচ্ছে—'মনের বিকাশ কর ও তাকে সংযত কর,' তারপর যেখানে ইচ্ছা তাকে প্রয়োগ কর—তাতে ফল খুব শীঘ্র হবে। এইটি হচ্ছে যথার্থ আত্মোন্নতির উপায়। একাগ্রতা শিক্ষা কর, আর যে দিকে ইচ্ছা তার প্রয়োগ কর। এরূপ করলে তোমায় কিছুই খোয়াতে হবে না। যে সমস্তটাকে পায়, সে অংশটাকেও পায়। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

"আমি প্রথমে তাকে দেখলাম, সেও আমায় দেখলে; আমিও তার প্রতি কটাক্ষ করলাম, সেও আমার প্রতি কটাক্ষ করলে"—এইরূপ চলতে লাগল। শেষে দুটি আত্মা এমন সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে গেল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে এক হয়ে গেল।

দুরকম সমাধি আছে: এক রকম হচ্ছে সবিকল্প—এতে একটু দ্বৈতের আভাস থাকে। আর এক রকম হচ্ছে নির্বিকল্প—ধ্যানের দ্বারা জ্ঞাতা-জ্ঞেয় অভেদ হয়ে যায়।

প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ভাবের সঙ্গে তোমাকে সহানুভূতিসম্পন্ন হতে শিক্ষা করতে হবে, তারপর একেবারে উচ্চতম অদ্বৈতভাবে লাফিয়ে যেতে হবে। নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা লাভ করে তারপর ইচ্ছা করলে আপনাকে আবার সীমাবদ্ধ করতে পার। প্রত্যেক কাজে নিজের সমুদয় শক্তি-প্রয়োগ কর। খানিকক্ষণের জন্য অদ্বৈতভাব ভুলে দ্বৈতবাদী হবার শক্তি-

লাভ করতে হবে, আবার যখন খুসি যেন ঐ অদ্বৈতভাব আশ্রয় করতে পারা যায়।

* * *

কার্য্যকারণ সব মায়া, আর আমরা যত বড় হব ততই বুঝব যে ছোট ছেলেদের পরীর গল্প যেমন আমাদের কাছে বোধ হয়, তেমনি যা কিছু আমরা দেখছি সবই ঐরূপ অসংবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকারণ বলে কিছু নেই, আর আমরা কালে তা জানতে পারব। সুতরাং যদি পার ত যখন কোন রূপক গল্প শুনবে, তখন তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু নামিয়ে এনো, মনে মনে ঐ গল্পের পূর্ব্বাপর সঙ্গতির বিষয় প্রশ্ন তুলো না। হৃদয়ে রূপক-বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বের প্রতি অনুরাগের বিকাশ কর, তারপর সমুদয় পৌরাণিক বর্ণনাগুলিকে কবিত্বহিসাবে উপভোগ কর। পুরাণ-চর্চ্চার সময় ইতিহাস ও বিচারের দৃষ্টি নিয়ে এসো না। ঐ সব পৌরাণিক ভাবগুলি তোমার মনের ভিতর দিয়ে প্রবাহাকারে চলে যাক। তোমার চোখের সামনে তাকে মশালের মত ঘোরাও—কে মশালটা ধরে রয়েছে এ প্রশ্ন করো না, তা হলেই সেটা চক্রাকার ধারণ করবে, এতে যে সত্যের কণা অন্তর্নিহিত রয়েছে, তা তোমার মনে থেকে যাবে।

সকল পুরাণ-লেখকেরাই, তাঁরা যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন, সেইগুলি রূপকভাবে লিখে গেছেন। তাঁরা কতকগুলি প্রবাহাকার-চিত্র এঁকে গেছেন। তার ভিতর থেকে কেবল তার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বার করবার চেষ্টা করে ছবিগুলিকে নষ্ট করে ফেলো না। সেগুলিকে যথাযথ গ্রহণ কর, সেগুলি তোমার উপর কার্য্য করুক। এদের ফলাফল দেখে বিচার করো—তাদের মধ্যে যেটুকু ভাল আছে সেটুকুই নাও।

* * *

তোমাব নিজের ইচ্ছাশক্তিই তোমার প্রার্থনায় উত্তর দিয়ে থাকে—তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধারণা অনুসারে সেটা বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। আমরা তাকে বুদ্ধ, যীশু, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে আমাদের আত্মা।

* * *

আমাদের ধারণার ক্রমে উৎকর্ষ হতে থাকে, কিন্তু ঐ ধারণা যে-সকল রূপকাকারে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, তাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। আমাদের অলৌকিক দর্শনসমূহ অপেক্ষা মুশার অলৌকিক দর্শনে ভুলের সম্ভাবনা অধিক, কারণ আমরা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং আমাদের মিথ্যা ভ্রম দ্বারা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

যতদিন না আমাদের হৃদয়রূপ শাস্ত্র খুলছে, ততদিন শাস্ত্রপাঠ বৃথা। তখন ঐ শাস্ত্রগুলি আমাদের হৃদয়শাস্ত্রের সঙ্গে যতটা মেলে ততটাই তাদের সার্থকতা। বলবান ব্যক্তিই বল কি তা বুঝতে পারে, হাতীই সিংহকে বুঝতে পারে, ইঁদুর কখন সিংহকে বুঝতে পারে না। আমরা যতদিন না যীশুর সমান হচ্ছি, ততদিন আমরা যীশুকে কেমন করে বুঝবো? দুখানা পাঁউরুটিতে ৫০০০ লোক খাওয়ান, অথবা ৫ খানা পাঁউরুটিতে দুজন লোক খাওয়ান—এই দুইই মায়ার রাজ্যে। এদের মধ্যে কোনটাই সত্য নয়, সুতরাং এই দুটোর কোনটাই অপরটির দ্বারা বাধিত হয় না। মহত্ত্বই কেবল মহত্ত্বের আদর করতে পারে, ঈশ্বরই ঈশ্বরের উপলব্ধি করতে পারেন। একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়, তার অন্য কোন ভিত্তি নেই। ঐ স্বপ্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টা পৃথক বস্তু নয়। সমগ্র সঙ্গীতটার ভিতর 'সোঽহং' 'সোঽহং' এই এক সুর বাজছে, অন্যান্য সুরগুলি তারই ওলটপালট

মাত্র, সুতরাং তাতে মূল সুরের—মূল তত্ত্বের কিছু এসে যায় না। জীবন্ত শাস্ত্র আমরাই, আমরা যে সব কথা বলেছি, সেইগুলিই শাস্ত্র বলে পরিচিত। সবই জীবন্ত ঈশ্বর, জীবন্ত খ্রীষ্ট—ঐ ভাবে সব দর্শন কর। মানুষকে অধ্যয়ন কর, মানুষই জীবন্ত কাব্য। জগতে এ পর্য্যন্ত যত বাইবেল, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ হয়েছেন, সবই আমাদের জ্যোতিঃতে জ্যোতিষ্মান। ঐ জ্যোতিঃকে ছেড়ে দিলে ঐগুলি আমাদের পক্ষে আর জীবন্ত থাকবে না, মৃত হয়ে যাবে। তোমার নিজ আত্মার উপর দাঁড়াও।

মৃতদেহের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহারই কর না, সে তাতে কোন বাধা দেয় না। আমাদের দেহকে ঐরূপ মৃতবৎ করে ফেলতে হবে, আর তার সঙ্গে যে আমাদের অভিন্ন ভাব রয়েছে, সেটাকে দূর করে ফেলতে হবে।

৩রা আগষ্ট, শনিবার

যে-সকল ব্যক্তি এই জন্মেই মুক্তিলাভ করতে চায়, তাদের এক জন্মেই হাজার বছরের কাজ করে নিতে হয়। তারা যে যুগে জন্মেছে, সেই যুগের ভাবের চেয়ে তাদের অনেক এগিয়ে যেতে হয়; কিন্তু সাধারণ লোক কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে পারে। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের এইরূপেই উৎপত্তি।

* * *

একজন হিন্দু রাণী ছিলেন—তাঁর ছেলেরা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করুক, এই বিষয়ে তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল যে, তিনি নিজেই তাদের লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার নিয়েছিলেন। তিনি অতি শৈশবাবস্থা থেকে তাদের দোল দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবার সময় সর্ব্বদা তাদের কাছে এই একটি গান গাইতেন—তত্ত্বমসি, তত্ত্বমসি। তাদের তিন জন সন্ন্যাসী হয়ে গেল,

কিন্তু চতুর্থ পুত্রকে রাজা করবার জন্য অন্যত্র নিয়ে গিয়ে মানুষ করা হতে লাগল। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর মা তাঁকে এক টুকরা কাগজ দিয়ে বল্লেন, 'বড় হলে এতে কি লেখা আছে পড়ো।' সেই কাগজখানাতে লেখা ছিল—"ব্রহ্ম সত্য, আর সব মিথ্যা। আত্মা কখন মরেনও না, মারেনও না। নিঃসঙ্গ হও, অথবা সৎসঙ্গে বাস কর।" যখন রাজপুত্র বড় হয়ে এইটি পড়লেন, তিনিও তখনই সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন।

সংসারত্যাগ কর। আমরা এখন যেন একপাল কুকুর—রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি, এক টুকরা মাংস খাচ্ছি, আর ভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, পাছে কেউ এসে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। তা না হয়ে রাজার মত হও—জেনে রাখ, সমুদয় জগৎ তোমার। যতক্ষণ না তুমি সংসারত্যাগ করছ, যতক্ষণ সংসার তোমায় বাঁধতে থাকবে, ততক্ষণ এ ভাবটি তোমার কখনই আসতে পারে না। যদি বাইরে ত্যাগ করতে না পার, মনে মনে সব ত্যাগ কর। প্রাণের ভিতর থেকে সব ত্যাগ কর। বৈরাগ্যসম্পন্ন হও। এই হল যথার্থ আত্মত্যাগ—এ না হলে ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। কোন প্রকার বাসনা করো না; কারণ যা বাসনা করবে তাই পাবে। আর সেইটাই তোমার ভয়ানক বন্ধনের কারণ হবে। যেমন সেই গল্পে আছে এক ব্যক্তি তিনটি বর লাভ করেছিলেন এবং তার ফলে তার সর্ব্বাঙ্গে নাক † হয়েছিল, বাসনা করলে ঠিক সেই রকম হয়। যতক্ষণ না

† গল্পটি এই: একজন গরীব লোক এক দেবতার কাছে বর পেয়েছিল। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি এই পাশা নাও। এই পাশা নিয়ে যে-কোন কামনা করে তিনবার ফেলবে, সে তিন কামনাই তোমার পূর্ণ হবে।' সে অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল—কি বর চাওয়া যায়। স্ত্রী বল্লে,

আমরা আত্মরত ও আত্মতৃপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ মুক্তিলাভ করতে পারছি না। আত্মাই আত্মার মুক্তিদাতা, অন্য কেহ নয়।

এইটি অনুভব করতে শিক্ষা কর যে, তুমি অন্য সকলের দেহেও বর্ত্তমান—এইটি জানবার চেষ্টা কর যে, আমরা সকলেই এক। আর সব বাজে জিনিস ছেড়ে দাও। তুমি ভাল মন্দ যা কিছু কাজ করেছ, তাদের সম্বন্ধে একদম ভেবো না—সেগুলি থু থু করে উড়িয়ে দাও। যা করেছ, করেছ। কুসংস্কার দূর করে দাও। মৃত্যু সম্মুখে এলেও দুর্ব্বলতা আশ্রয় করো না। অনুতাপ করো না—পূর্ব্বে যে সব কাজ করেছ, সে সব নিয়ে মাথা ঘামিও না; এমন কি, যে সব ভাল কাজ করেছ, তাও স্মৃতিপথ থেকে দূর করে দাও। আজাদ (মুক্ত) হও। দুর্ব্বল, কাপুরুষ ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও আত্মাকে লাভ করতে পারে না। তুমি কোন কর্ম্মের ফলকে নষ্ট করতে

'ধনদৌলত চাও।' কিন্তু স্বামী বল্লে, 'দেখ, আমাদের দুজনেরই নাক খাঁদা, তাই দেখে লোকে আমাদের বড় ঠাট্টা করে, অতএব প্রথমবার পাশা ফেলে সুন্দর নাক প্রার্থনা করা যাক।' স্ত্রীর মত কিন্তু তা নয়। শেষে দুজনে ঘোর তর্ক বাধ্‌ল। অবশেষে স্বামী রেগে গিয়ে এই বলে পাশা ফেল্লে—'আমাদের কেবল সুন্দর নাক হক, আর কিছু চাই না।' আশ্চর্য্য, যেমন পাশা ফেলা অমনি তাদের সর্ব্বাঙ্গে রাশি রাশি নাক হল। তখন সে দেখলে এ কি বিপদ হল! তখন দ্বিতীয়বার পাশা ফেলে বল্লে, 'নাক চলে যাক্'। অমনি সব নাক চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজের নাকও চলে গেল। এখন বাকি আছে তৃতীয় বর। তখন তারা ভাবলে—যদি এইবার পাশা ফেলে ভাল নাক পাই, লোকে অবশ্য আমাদের খাঁদা নাকের বদলে ভাল নাক হবার কারণ জিজ্ঞাসা করবে—তাদের অবশ্য সব কথা বলতে হবে। তখন তারা আমাদের আহাম্মক বলে এখনকার চেয়ে বেশী ঠাট্টা করবে; বলবে যে এরা এমন তিনটি বর পেয়েও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারলে না। কাজেই তৃতীয়বার পাশা ফেলে তারা তাদের পুরাতন খাঁদা নাকই ফিরিয়ে নিলে।

পার না—ফল আসবেই আসবে ; সুতরাং সাহসী হয়ে তার সম্মুখীন হও, কিন্তু সাবধান যেন পুনর্ব্বার সেই কাজ করো না। সকল কর্ম্মের ভার সেই ভগবানের ঘাড়ে ফেলে দাও, ভাল-মন্দ—সব দাও। নিজে ভালটা রেখে কেবল মন্দটা তাঁর ঘাড়ে চাপিও না। যে নিজেকে নিজে সাহায্য না করে, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন।

* * *

"বাসনা-মদিরা পান করে সমস্ত জগৎ মত্ত হয়েছে।" "যেমন দিবা ও রাত্রি কখন একসঙ্গে থাকতে পারে না, সেইরূপ বাসনা ও ভগবান দুই কখন একসঙ্গে থাকতে পারে না।" সুতরাং বাসনাত্যাগ কর।

'জহাঁ রাম তহাঁ কাম নহী, জহাঁ কাম তহাঁ নহী রাম।
দুহুঁ একসাথ মিলত নহী, রব রজনী এক ঠাম॥'

* * *

'খাবার খাবার' বলে চেঁচান ও খাওয়া, 'জল জল' বলে চেঁচান ও জল পান করা—এই দুটোর ভিতর আকাশ-পাতাল তফাৎ ; সুতরাং কেবল 'ঈশ্বর ঈশ্বর' বলে চেঁচালে কখনও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আশা করতে পারা যায় না। আমাদের ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্টা ও সাধন করতে হবে।

তরঙ্গটা সমুদ্রের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেলেই অসীমত্ব লাভ করতে পারে, কিন্তু তরঙ্গ-অবস্থায় থেকে কখন পারে না। তারপর সমুদ্রস্বরূপ হয়ে গিয়ে আবার তরঙ্গাকার ধারণ করতে পারে ও যত বড় ইচ্ছা তত বড় তরঙ্গ হতে পারে। নিজেকে তরঙ্গ বলে মনে করো না ; জান যে তুমি মুক্ত।

প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র হচ্ছে কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতিকে প্রণালীবদ্ধ করা। যেখানে বুদ্ধিবিচারের শেষ, সেইখানেই ধর্ম্মের আরম্ভ। সমাধি বা ঈশ্বর-

ভাবাবেশ যুক্তিবিচারের চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু ঐ অবস্থায় উপলব্ধ সত্যগুলি কখনও যুক্তিবিচারের বিরোধী হবে না। যুক্তিবিচার মোটা হাতিয়ারের মত, তা দিয়ে শ্রমসাধ্য কাজগুলো করতে পারা যায়, আর সমাধি বা ঈশ্বরভাবাবেশ (inspiration) উজ্জ্বল আলোকের মত সব সত্য দেখিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের ভিতর একটা কিছু করবার ইচ্ছা বা প্রেরণা আসাকেই ঈশ্বরভাবাবেশ (inspiration) বলতে পারা যায় না।

* * *

মায়ার ভিতর উন্নতি করা বা অগ্রসর হওয়াকে একটি বৃত্ত বলে বর্ণনা করা যেতে পারে—এতে এই হয় যে, যেখান থেকে তুমি যাত্রা করেছিলে, ঠিক সেইখানে এসে পৌঁছুবে। তবে প্রভেদ এই যে, যাত্রা করবার সময় তুমি অজ্ঞান ছিলে, আর সেখানে যখন ফিরে আসবে তখন তুমি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছ। ঈশ্বরোপাসনা, সাধু-মহাপুরুষদের পূজা, একাগ্রতা, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম—মায়ার জাল কেটে বেরিয়ে আসবার এই সব উপায়; তবে প্রথমেই আমাদের তীব্র মুমুক্ষুত্ব থাকা চাই। যে জ্যোতিঃ দপ্ করে প্রকাশ হয়ে আমাদের হৃদয়ান্ধকারকে দূর করে দেবে, তা আমাদের ভিতরেই রয়েছে—এ হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা আমাদের স্বভাব বা স্বরূপ। (ঐ জ্ঞানকে আমাদের 'জন্মগত স্বত্ব' বলা যেতে পারে না, কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্মই নেই।) কেবল যে মেঘগুলো ঐ জ্ঞানসূর্য্যকে ঢেকে রয়েছে, আমাদের সেইগুলোকে দূর করে দিতে হবে।

ইহলোকে বা স্বর্গে সর্ব্বপ্রকার ভোগ করবার বাসনা ত্যাগ কর (ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ)। ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত কর (দম ও শম)। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ সহ্য কর, মন যেন জানতেই না পারে যে, তোমার কোনরূপ দুঃখ এসেছে (তিতিক্ষা)। মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর করে দাও,

গুরু ও তাঁর উপদেশে বিশ্বাস রাখ এবং তুমি যে নিশ্চিত মুক্ত হতে পারবেই, এটিও বিশ্বাস কর (শ্রদ্ধা)। যাই হক না কেন, সদাই বল সোঽহং সোঽহং। খেতে, বেড়াতে, কষ্টে পড়ে, সর্ব্বদাই সোঽহং সোঽহং বল, সর্ব্বদাই মনকে বল যে, এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখছি, কোন কালে এর অস্তিত্ব নেই, কেবল আমি মাত্র আছি (সমাধান)। দেখ্‌বে—একদিন দপ্ করে জ্ঞানের প্রকাশ হয়ে বোধ হবে জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ব্রহ্মই আছেন। মুক্ত হবার জন্য প্রবল ইচ্ছাসম্পন্ন হও (মুমুক্ষুত্ব)।

আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সব পুরাণো অন্ধকূপের মত; আমরা ঐ অন্ধকূপে পড়ে কর্ত্তব্য, বন্ধন প্রভৃতি নানা স্বপ্ন দেখে থাকি—ঐ স্বপ্নের আর শেষ নেই। কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে আর ভ্রমের সৃষ্টি করো না। এ যেন বটগাছের মত, ক্রমাগত ঝুটি নামিয়ে বাড়তেই থাকে। যদি তুমি দ্বৈতবাদী হও, তবে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে যাওয়াই তোমার আহাম্মকি। আর যদি অদ্বৈতবাদী হও, তবে তুমি ত স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ—তোমাব আবার কর্ত্তব্য কি? তোমার স্বামী, ছেলেপুলে, বন্ধুবান্ধব—কারও প্রতি কিছু কর্ত্তব্য নেই। যা হচ্ছে হয়ে যাক্, চুপচাপ করে পড়ে থাক।

"রামপ্রসাদ বলে ভব-সাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা;
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা॥"

শরীর মরে মরুক—আমার যে একটা দেহ আছে, এটা ত একটা পুরাণো উপকথা বই আর কিছু নয়। চুপচাপ করে থাক, আর আমি ব্রহ্ম বলে জান।

কেবল বর্ত্তমান কালই বিদ্যমান—আমরা চিন্তায় পর্য্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারি না; কারণ চিন্তা করতে গেলেই তাকে

বর্ত্তমান করে ফেলতে হয়। সব ছেড়ে দাও, তার যেখানে যাবার ভেসে যাক। এই সমগ্র জগৎটাই একটা ভ্রমমাত্র, এটা যেন তোমায় আর প্রতারিত করতে না পারে। জগৎটাকে তুমি সেটা যা নয় তাই বলে জেনেছ, অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান করেছ, এখন এটা বাস্তবিক যা একে তাই বলে জান। যদি দেহটা কোথাও ভেসে যায়, যেতে দাও; দেহ যেখানেই যাক না কেন, কিছু গ্রাহ্য করো না, কর্ত্তব্য বলে একটা কিছু আছে এবং তাকে পালন করতেই হবে—এইরূপ ধারণা ভীষণ কালকূট-স্বরূপ, এতে জগৎকে নষ্ট করে ফেলছে।

স্বর্গে গেলে একটা বীণা পাবে, আর তাই বাজিয়ে যথাসময়ে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করবে—এর জন্য অপেক্ষা করো না। এইখানেই একটা বীণা নিয়ে আরম্ভ করে দাও না কেন? স্বর্গে যাবার জন্য অপেক্ষা করা কেন? ইহলোকটাকেই স্বর্গ করে ফেল। তোমাদের বইয়ে আছে, স্বর্গে বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া নেই—তাই যদি হয়, এখনই তা আরম্ভ করে দাও না কেন? এইখানেই বিবাহ তুলে দাও না কেন? সন্ন্যাসীর গৈরিক বসন মুক্তপুরুষের চিহ্ন। সংসারিত্বরূপ ভিক্ষুকের বেশ ফেলে দাও। মুক্তির পতাকা—গৈরিক বস্ত্র ধারণ কর।

৪ঠা আগষ্ট, রবিবার

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁকে না জেনে উপাসনা করছে, আমি তোমার নিকট তাঁরই কথা প্রচার করছি।'

এই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সকল জ্ঞাত বস্তুর চেয়ে আমাদের অধিক জ্ঞাত। তিনিই সেই এক বস্তু, যাঁকে আমরা সর্ব্বত্র দেখছি। সকলেই তাদের নিজ আত্মাকে জানে, সকলেই এমন কি, পশুরা পর্য্যন্ত জানে যে

আমি আছি। আমরা যা কিছু জানি সব আত্মারই বহিঃপ্রসারণ, বিস্তার-স্বরূপ। ছোট ছোট ছেলেদের এ তত্ত্ব শিখাও, তারাও এ তত্ত্ব ধারণা করতে পারে। প্রত্যেক ধর্ম্ম (কোন কোন স্থলে অজ্ঞাতসারে হলেও) এই আত্মাকেই উপাসনা করে এসেছে, কারণ আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই।

আমরা এই জীবনটাকে এখানে যেমন ভাবে জানি, তার প্রতি এরূপ ঘৃণিতভাবে আসক্ত হয়ে থাকাই সমুদয় অনিষ্টের মূল। তাই থেকে এই সব প্রতারণা চুরি ইত্যাদি হয়ে থাকে। এরই জন্য লোকে টাকাকে দেবতার আসন দেয়, আর তা থেকেই যত পাপ ও ভয়ের উৎপত্তি হয়। কোন জড়বস্তুকে মূল্যবান বলে মনে করো না, আর তাতে আসক্ত হয়ো না। তুমি যদি কিছুতে, এমন কি, জীবনে পর্য্যন্ত আসক্ত না হও, তা হলে আর কোন ভয় থাকবে না। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"—যিনি এই জগতে নানা দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন। আমরা যখন সবই এক দেখি, তখন আমাদের শরীরের মৃত্যুও থাকে না, মনের মৃত্যুও থাকে না। জগতের সকল দেহই আমার, সুতরাং আমারি দেহও নিত্য; কারণ গাছপালা, জীবজন্তু, চন্দ্রসূর্য্য, এমন কি, সমগ্র জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডই আমার দেহ—তবে ঐ দেহের নাশ হবে কি করে? প্রত্যেক মন, প্রত্যেক চিন্তাই আমার—তবে মৃত্যু আসবে কি করে? আত্মা কখন জন্মানও না, মরেনও না—যখন আমরা এইটে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি, তখন সকল সন্দেহ উড়ে যায়; 'আমি আছি,' 'আমি অনুভব করছি,' 'আমি সুখী হচ্ছি'—'অস্তি, ভাতি, প্রিয়'—এগুলির উপর কখনই সন্দেহ করা যেতে পারে না। আমার ক্ষুধা বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ জগতে যে-কেউ যা-কিছু খাচ্ছে, তা আমি খাচ্ছি। আমাদের যদি এক গাছা চুল উঠে যায়, আমরা

মনে করি না যে আমরা মলাম। সেই রকম যদি একটা দেহের মৃত্যু হয়, ওত ঐ একগাছা চুল উঠে যাওয়ারই মত।

*　　　*　　　*

সেই জ্ঞানাতীত বস্তুই ঈশ্বর—তিনি বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অতীত।···তিনটে অবস্থা আছে—পশুত্ব (তমঃ), মনুষ্যত্ব (রজঃ) ও দেবত্ব (সত্ত্ব)। যাঁরা সর্ব্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেন, তাঁরা অস্তিমাত্র বা সৎস্বরূপমাত্র হয়ে থাকেন। তাঁদের পক্ষে কর্ত্তব্যের একেবারে নাশ হয়ে যায়, তাঁরা কেবল লোককে ভালবাসেন, আর চুম্বকের মত অপরকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করেন। এরই নাম মুক্তি। তখন আর চেষ্টা করে কোন সৎকার্য্য করতে হয় না, তখন তুমি যে কাজ করবে তাই সৎকার্য্য হয়ে যাবে। ব্রহ্মবিৎ যিনি, তিনি সকল দেবতার চেয়েও বড়। যীশুখ্রীষ্ট যখন মোহকে জয় করে 'শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হ' বলেছিলেন, তখনই দেবতারা তাঁকে পূজা করতে এসেছিলেন। ব্রহ্মবিৎকে কেউ কিছু সাহায্য করতে পারে না, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ তাঁর সামনে প্রণত হয়ে থাকে, তাঁর সকল বাসনাই পূর্ণ হয়, তাঁর আত্মা অপরকে পবিত্র করে থাকে। অতএব যদি ঈশ্বরলাভের কামনা কর, তবে ব্রহ্মবিদের পূজা কর। যখন আমরা দেবানুগ্রহস্বরূপ মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয় লাভ করি, তখনই বুঝতে হবে মুক্তি আমাদের করতলগত।

*　　　*　　　*

চিরকালের জন্য দেহের মৃত্যুর নামই নির্ব্বাণ। এটা নির্ব্বাণ-তত্ত্বের 'না'-এর দিক। এতে কেবল বলে—আমি এটা নই, ওটা নই। বেদান্ত আর একটু অগ্রসর হয়ে 'হা-এর' দিকটা বলেন—ওরই নাম মুক্তি। 'আমি অনন্ত-সত্তা, অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-আনন্দ, আমিই সেই'—এই হল

বেদান্ত—একটা নিখুঁতভাবে তৈরী খিলানের যেন মাঝখানকার পাথর।

বৌদ্ধধর্ম্মের উত্তরাম্নায়ভুক্ত বেশীর ভাগ লোকই মুক্তিতে বিশ্বাসী—তারা যথার্থই বৈদান্তিক। কেবল সিংহলবাসীরাই নির্ব্বাণকে বিনাশের সহিত সমানার্থকভাবে গ্রহণ করে।

কোনরূপ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস 'আমি'কে নাশ করতে পারে না। যেটার অস্তিত্ব বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ও যা অবিশ্বাসে উড়ে যায়, তা ভ্রমমাত্র। আত্মাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। আমি আমার আত্মাকে নমস্কার করি। 'স্বয়ংজ্যোতিঃ আমি নিজেকেই নমস্কার করি, আমি ব্রহ্ম।' এই দেহটা যেন একটা অন্ধকার ঘর ; আমরা যখন ঐ ঘরে প্রবেশ করি তখনই তা আলোকিত হয়ে ওঠে, তখনই তা জীবন্ত হয়। আত্মার এই স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃকে কিছুই স্পর্শ করতে পারে না, একে কোনমতেই নষ্ট করা যায় না। একে আবৃত করা যেতে পারে, কিন্তু কখনও নষ্ট করা যায় না।

* * *

বর্ত্তমান যুগে ভগবানকে অনন্তশক্তিস্বরূপিণী জননীরূপে উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এতে পবিত্রতার উদয় হবে, আর এই মাতৃপূজায় আমেরিকার মহাশক্তির বিকাশ হবে। এখানে (আমেরিকায়) কোন মন্দির (পৌরোহিত্যশক্তি) আমাদের গলা টিপে ধরে নেই, আর অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোর মত এখানে কেউ কষ্টভোগ করে না। স্ত্রীলোকেরা শত শত যুগ ধরে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে, তাইতে তাদের ভিতর অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের বিকাশ হয়েছে। তারা কোন ভাব সহজে ছাড়তে চায় না। এই হেতুই তারা কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মসমূহের এবং সকল দেশের

পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকস্বরূপ হয়ে থাকে, আর এইটেই পরে তাদের স্বাধীনতার কারণ হবে। আমাদের বৈদান্তিক হয়ে বেদান্তের এই মহান ভাবকে জীবনে পরিণত করতে হবে। নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও ঐ ভাব দিতে হবে—এটা কেবল স্বাধীন আমেরিকাতেই কার্যে পবিণত করা যেতে পারে। ভারতে বুদ্ধ, শঙ্কর ও অন্যান্য মহামনীষী ব্যক্তি এই সকল ভাব লোকসমক্ষে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকে সে গুলি ধরে রাখতে পারে নি। এই নূতন যুগে নিম্নজাতিরা বেদান্তেব আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করবে, আব স্ত্রীলোকদের দ্বারাই এটা কার্যে পবিণত হবে।

"আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে,
মন, তুমি দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সঙ্গে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে। (মাঝে মাঝে)
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী যত, নিকট হতে দিয়ো নাক,
জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখ, সে যেন সাবধানে থাকে।"

"যত কিছু প্রাণী জীবনধারণ করছে, তুমি সেই সকলেব পারে। তুমি আমার জীবনের সুধাকরস্বরূপ, আমাব আত্মারও আত্মা।"

রবিবার, অপরাহ্ণ

দেহ যেমন মনের হাতে একটা যন্ত্রবিশেষ, মনও তেমনি আত্মার হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ। জড় হচ্ছে বাইরের গতি, মন হচ্ছে ভিতরের গতি। সমুদয় পরিণামের আরম্ভ ও সমাপ্তি কালে। আত্মা যদি অপরিণামী হন, তিনি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ; আর যদি পূর্ণস্বরূপ হন, তবে

তিনি অনন্তস্বরূপ; আর অনন্তস্বরূপ হলে অবশ্যই তিনি দ্বিতীয়-রহিত; কারণ দুটি অনন্ত আর থাকতে পারে না, সুতরাং আত্মা একমাত্রই হতে পারেন। যদিও আত্মাকে বহু বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক। যদি কোন ব্যক্তি সূর্য্যের অভিমুখে চলতে থাকে, প্রতি পদক্ষেপে সে এক একটা বিভিন্ন সূর্য্য দেখবে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবগুলি ত সেই একই সূর্য্য।

'অস্তিই' হচ্ছে সর্ব্বপ্রকার একত্বের ভিত্তিস্বরূপ, আর ঐ ভিত্তিতে যেতে পারলেই পূর্ণতালাভ হয়। যদি সব রঙকে এক রঙে পরিণত করা সম্ভব হত, তবে চিত্রবিদ্যাই লোপ পেয়ে যেতো। সম্পূর্ণ একত্ব হচ্ছে বিশ্রাম বা লয়স্বরূপ; আমরা সকল প্রকাশই এক ঈশ্বর হতে প্রসূত বলে থাকি। টাওবাদী*, কুংফুছ (Confucius)-মতাবলম্বী, বৌদ্ধ, হিন্দু, য়াহুদী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও জরথুষ্ট্র-শিষ্যগণ (Zoroastrians) সকলেই প্রায় একপ্রকার ভাষায় "তুমি অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার চাও, অপরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার কর"—এই অপূর্ব্ব নীতি প্রচার করেছেন। কিন্তু হিন্দুরাই কেবল এই বিধির ব্যাখ্যা দিয়েছেন; কারণ তাঁরা এর কারণ দেখতে পেয়েছিলেন। মানুষকে অপর সকলকেই ভালবাসতে হবে; কারণ সেই অপর সকলে যে সে ছাড়া কিছু নয়। এক অনন্ত বস্তুই রয়েছে কিনা।

জগতে যত বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্য হয়েছেন তন্মধ্যে কেবল লাওট্জে, বুদ্ধ ও যীশুই উক্ত নীতিরও উপরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে গেছেন—

* খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনদেশে লাওটজে-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসম্প্রদায়। ইঁহাদের মত প্রায় বেদান্তসদৃশ। 'টাও'-এর ধারণা অনেকটা বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মসদৃশ।

'তোমার শত্রুদিগকে পর্য্যন্ত ভালবাস', 'যারা তোমায় ঘৃণা করে তাদেরও ভালবাস'।

তত্ত্বসমূহ পূর্ব্ব থেকেই রয়েছে; আমরা তাদের সৃষ্টি করি না, আবিষ্কার করি মাত্র। ধর্ম্ম কেবল প্রত্যক্ষানুভূতিমাত্র। বিভিন্ন মতামত পথস্বরূপ—প্রণালীস্বরূপ মাত্র, ওগুলো ধর্ম্ম নয়। জগতের যত ধর্ম্ম, সব বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন-অনুযায়ী ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। শুধু মতে কেবল বিরোধ বাঁধিয়ে দেয়; দেখ না, কোথায় ঈশ্বরের নামে লোকের শান্তি হবে—তা না হয়ে জগতে যত রক্তপাত হয়েছে, তার অর্দ্ধেক ঈশ্বরের নাম নিয়ে হয়েছে। একেবারে মূলে যাও; স্বয়ং ঈশ্বরকেই জিজ্ঞাসা কর—তিনি 'কিংস্বরূপ'? যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, বুঝতে হবে তিনি নেই। কিন্তু জগতের সকল ধর্ম্মই বলে যে, তিনি উত্তর দিয়ে থাকেন।

তোমার নিজের যেন কিছু বলবার থাকে, তা না হলে অপরে কি বলেছে তার কোনরূপ ধারণা করতে পারবে কেন? পুরাতন কুসংস্কার নিয়ে পড়ে থেকো না, সর্ব্বদাই নূতন সত্যসমূহের জন্য প্রস্তুত হও। "মূর্খ তারা, যারা তাদের পূর্ব্বপুরুষদের খোঁড়া কুয়ার নোন্‌তা জল খাবে, কিন্তু অপরের খোঁড়া কুয়ার বিশুদ্ধ জল খাবে না।" আমরা যতক্ষণ না নিজেরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করছি, ততক্ষণ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বভাবতঃ পূর্ণস্বরূপ। অবতারেরা তাঁদের এই পূর্ণস্বরূপকে প্রকাশ করেছেন, আমাদের ভিতর এখনও ওটা অব্যক্তভাবে রয়েছে। আমরা কি করে বুঝব যে মুশা ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন, যদি আমরাও তাঁকে দেখতে

না পাই? যদি ঈশ্বর কখনও কারও কাছে এসে থাকেন ত আমারও কাছে আসবেন। আমি একেবারে সোজাসুজি তাঁর কাছে যাব, তিনি আমার সঙ্গে কথা কন। বিশ্বাসকে ভিত্তি বলে আমি গ্রহণ করতে পারি না—সেটা নাস্তিকতা ও ঘোর ঈশ্বরনিন্দামাত্র। যদি ঈশ্বর দুহাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কয়ে থাকেন, তিনি আজ আমার সঙ্গেও কথা কইতে পারেন। তা না হলে কি করে জানব, তিনি মরে যান নি? যে কোন রকমে হক, ঈশ্বরের কাছে এস—কিন্তু আসা চাই। তবে আসবার সময় যেন কাউকে ঠেলে ফেলে দিও না।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি করুণা রাখবেন। যিনি জ্ঞানী, তিনি একটা পিঁপড়ের জন্য পর্য্যন্ত নিজের দেহ ত্যাগ করতে রাজী থাকেন, কারণ তিনি জানেন দেহটা কিছুই নয়।

৫ই আগষ্ট, সোমবার

প্রশ্ন এই, সর্ব্বোচ্চ অবস্থালাভ করতে গেলে কি সমুদয় নিম্নতর সোপান দিয়ে যেতে হবে, না একেবারে লাফিয়ে সেই অবস্থায় যাওয়া যেতে পারে? আধুনিক মার্কিন বালক আজ যে বিষয়টা পঁচিশ বছরে শিখে ফেলতে পারে, তার পূর্ব্বপুরুষদের সে বিষয় শিখতে একশ বছর লাগত। আধুনিক হিন্দু এখন বিশ বছরে সেই অবস্থায় আরোহণ করে, যে অবস্থা পেতে তার পূর্ব্বপুরুষদের আট হাজার বছর লেগেছিল। জড়ের দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায়, গর্ভে ভ্রূণ সেই প্রাথমিক জীবাণুর (amœba) অবস্থা থেকে আরম্ভ করে নানা অবস্থা অতিক্রম করে শেষে মানুষরূপ ধারণ করে। এই হল আধুনিক

বিজ্ঞানের শিক্ষা। বেদান্ত আরও অগ্রসর হয়ে বলেন, আমাদের শুধু সমগ্র মানবজাতির অতীত জীবনটা যাপন করলেই হবে না, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনটাও যাপন করতে হবে। যিনি প্রথমটি করেন, তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি; যিনি দ্বিতীয়টি করতে পারেন, তিনি জীবন্মুক্ত।

কাল কেবল আমাদের চিন্তার পরিমাপক মাত্র আর চিন্তার গতি অভাবনীয়রূপ দ্রুত চলে। আমরা কত শীঘ্র ভাবী জীবনটা যাপন করতে পারি তার কোন সীমা নির্দ্দেশ করা যেতে পারে না। সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবন নিজ জীবনে অনুভব করতে কতদিন লাগবে, তা নির্দ্দিষ্ট করে বলতে পারা যায় না। কারও কারও এক মুহূর্ত্তে সেই অবস্থালাভ হতে পারে, কারও বা পঞ্চাশ জন্ম লাগতে পারে। এটা ইচ্ছার তীব্রতার উপর নির্ভর করছে। সুতরাং শিষ্যের প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশও বিভিন্নরূপ হওয়া দরকার। জ্বলন্ত আগুন সকলের জন্যই রয়েছে—তাতে জল, এমন কি, বরফের চাঙ্গড় পর্য্যন্ত নিঃশেষ করে দেয়। একরাশ ছট্‌রা দিয়ে বন্দুক ছোড়, অন্ততঃ একটাও লাগবে। লোককে একেবারে এক রাশ সত্য দিয়ে দাও, তারা তার মধ্যে যেটুকু নিজের উপযোগী তা নিয়ে নেবে। অতীত বহু বহু জন্মের ফলে যার যেমন সংস্কার গঠিত হয়েছে, তাকে তদনুযায়ী উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম—এর মধ্যে যে কোন ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাবগুলোও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি দিয়ে সামঞ্জস্য করতে হবে, যোগপ্রবণ প্রকৃতিকে যুক্তিবিচারের দ্বারা সামঞ্জস্য করতে হবে, আর কর্ম্ম যেন সকল পথেরই অঙ্গস্বরূপ হয়। যে যেখানে আছে,

তাকে সেইখান থেকে ঠেলে এগিয়ে দাও ধর্ম্মশিক্ষা যেন ভাঙ্গাচোরার কাজে না থেকে গড়ার কাজ নিয়েই রাতদিন থাকে।

মানুষের প্রত্যেক প্রবৃত্তিই তাব অতীতের কর্ম্মসমষ্টির পরিচায়ক। এটা যেন সেই রেখা বা ব্যাসার্দ্ধ, যাকে অনুসরণ করে তাকে চলতে হবে। আবার সকল ব্যাসার্দ্ধ অবলম্বন কবেই কেন্দ্রে যাওয়া যায়। অপরের প্রবৃত্তি উল্টে দেবাব নামটি পর্য্যন্ত করো না, তাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েবই ক্ষতি হয়ে থাকে। যখন তুমি জ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছো, তখন তোমাকে জ্ঞানী হতে হবে, আব শিষ্য যে অবস্থায় রয়েছে, তোমাকে মনে মনে ঠিক সেই অবস্থায় অবস্থিত হতে হবে। অন্যান্য যোগেও এইরূপ। প্রত্যেক বৃত্তিব এমন ভাবে বিকাশসাধন করতে হবে যে, যেন সেটি ছাড়া আমাদের অন্য কোন বৃত্তিই নেই—এই হচ্ছে তথাকথিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতিসাধনের যথার্থ রহস্য অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে উদাবতা অর্জ্জন কর, কিন্তু সেটাকে হাবিয়ে নয়। আমরা অনন্তস্বরূপ—আমাদের মধ্যে কোন কিছুর ইতি করা যেতে পাবে না। সুতরাং আমরা সবচেয়ে নিষ্ঠাবান মুসলমানের মত গভীর, অথচ সবচেয়ে ঘোর নাস্তিকের মত উদার-ভাবাপন্ন হতে পারি। এটা কার্য্যে পরিণত করার উপায় হচ্ছে—মনকে কোন বিষয়বিশেষে প্রয়োগ করা নয়, আদত মনটারই বিকাশ করা ও তাকে সংযত করা। তা হলেই তুমি তাকে যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। এইরূপে তোমার গভীরতা ও উদারতা দুই-ই লাভ হবে। জ্ঞানের উপলব্ধি এমনভাবে কর যে, জ্ঞান ছাড়া যেন আর কিছু নাই; তারপর ভক্তিযোগ, রাজযোগ, কর্ম্মযোগ নিয়েও ঐ ভাবে সাধন কর। তরঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের দিকে যাও,

তবেই তোমার ইচ্ছামত বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গ উৎপাদন করতে পারবে। তোমার নিজের মনরূপ হ্রদকে সংযত কর, তা না হলে তুমি অপরের মনরূপ হ্রদের তত্ত্ব কখনও জানতে পারবে না।

তিনিই প্রকৃত আচার্য্য, যিনি তাঁর শিষ্যের প্রবৃত্তি বা রুচি অনুযায়ী নিজের সমস্ত শক্তিটা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। মানুষ যে একজন দায়িত্বপূর্ণ প্রাণী—এ ধারণা ছেড়ে দাও; কেবল পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই দায়িত্বজ্ঞান আছে। অজ্ঞান ব্যক্তিরা মোহমদিরা পান করে মাতাল হয়েছে, তাদের সহজ অবস্থা নেই। তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ—তোমাদের তাদের প্রতি অনন্তধৈর্য্যসম্পন্ন হতে হবে। তাদের প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব রেখো না; তারা যে রোগে আক্রান্ত হয়ে জগৎটাকে ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখছে, আগে সেই রোগ নির্ণয় কর; তার পর যাতে তাদের সেই রোগ-আরাম হয়, আর তারা ঠিক ঠিক দেখতে পায়, তদ্বিষয়ে সাহায্য কর। সর্ব্বদা স্মরণ রেখো যে, মুক্ত বা স্বাধীন পুরুষেরই কেবল স্বাধীন ইচ্ছা আছে—বাকি সকলেই বন্ধনের ভিতর রয়েছে—সুতরাং তারা যা করছে, তার জন্য তারা দায়ী নয়। ইচ্ছা যখন ইচ্ছা-রূপেই থাকে, তখন তা বদ্ধ। জল যখন হিমালয়ের চূড়ায় গলতে থাকে, তখন স্বাধীন বা উন্মুক্ত থাকে, কিন্তু নদীরূপ ধারণ করলেই তীরভূমি দ্বারা বদ্ধ হয়; তথাপি তার প্রাথমিক বেগই তাকে শেষে সমুদ্রে নিয়ে যায়, তথায় ঐ জল আবার সেই পূর্ব্বের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। প্রথমটা অর্থাৎ নদীরূপে আবদ্ধ হওয়াকেই বাইবেল 'মানবের পতন' (Fall of Man) ও দ্বিতীয়টিকে পুনরুত্থান (Resurrection) বলে লক্ষ্য করে গেছেন।

একটা পরমাণু পর্য্যন্ত, যতক্ষণ সে মুক্তাবস্থা লাভ না করছে ততক্ষণ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

কতকগুলি কল্পনা অন্য কল্পনাগুলির বন্ধন ভাঙ্গবার সাহায্য করে থাকে। সমগ্র জগৎটাই কল্পনা, কিন্তু এক রকমের কল্পনাসমষ্টি অপর সব কল্পনা-সমষ্টিকে নষ্ট করে দেয়। যে-সব কল্পনা বলে যে জগতে পাপ, দুঃখ, মৃত্যু রয়েছে, সে-সব কল্পনা বড় ভয়ানক; কিন্তু অপর রকমের কল্পনা, যাতে বলে—'আমি পবিত্রস্বরূপ, ঈশ্বর আছেন, জগতে দুঃখ কিছু নাই'—সেই-গুলিই শুভ কল্পনা, আর তাতেই অন্যান্য কল্পনার বন্ধন কাটিয়ে দেয়। সগুণ ঈশ্বরই মানবের সেই সর্ব্বোচ্চ কল্পনা, যাতে আমাদের বন্ধন-শৃঙ্খলের পাবগুলি ভেঙ্গে দিতে পারে।

ওঁ তৎসৎ, অর্থাৎ একমাত্র সেই নির্গুণ ব্রহ্মই মায়ার অতীত, কিন্তু সগুণ ঈশ্বরও নিত্য। যতদিন নায়াগারা-প্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনুও রয়েছে; কিন্তু এদিকে প্রপাতের জলরাশি ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ঐ জলপ্রপাত জগৎপ্রপঞ্চস্বরূপ, আর রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ; এই দুইটিই নিত্য। যতক্ষণ জগৎ রয়েছে, ততক্ষণ জগদীশ্বর অবশ্যই আছেন। ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করছেন, আবার জগৎ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছে—দুই-ই নিত্য। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়। নায়াগারা-প্রপাত ও রামধনু উভয়ই অনন্ত কালের জন্য পরিণামশীল—এরা মায়ার মধ্য দিয়ে দৃষ্ট ব্রহ্ম। পারসিক ও খ্রীষ্টিয়ানেরা মায়াকে দুই ভাগে ভাগ করে ভাল অর্দ্ধেকটাকে ঈশ্বর ও মন্দ অর্দ্ধেকটাকে শয়তান নাম দিয়েছেন। বেদান্ত মায়াকে সমষ্টি রূপে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং তার পশ্চাতে ব্রহ্মরূপ এক অখণ্ড বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন।

* * *

মহম্মদ দেখলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম সেমিটিক ভাব থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, আর ঐ সেমিটিক ভাবের মধ্য থেকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের কিরূপ হওয়া উচিত—তার যে একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করা উচিত—এইটিই তাঁর উপদেশের বিষয়। 'আমি ও আমার পিতা এক'—এই আর্য্যোচিত উপদেশের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন, ঐ উপদেশে তিনি ভয় খেতেন। প্রকৃতপক্ষে মানব হতে নিত্য পৃথক জিহোবা-সম্বন্ধীয় দ্বৈত ধারণার চেয়ে ত্রিত্ববাদের (Trinitarian) মত অনেক উন্নত। যে সকল ভাব-শৃঙ্খলা ক্রমশঃ ঈশ্বর ও মানবের একত্বজ্ঞান এনে দেয়, অবতারবাদ তাদের গোড়ার পাবস্বরূপ। লোকে প্রথম বোঝে, ঈশ্বর একজন মানবের দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার পর দেখে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, অবশেষে দেখতে পায় তিনি সব মানুষের ভিতর রয়েছেন। অদ্বৈতবাদ সর্ব্বোচ্চ সোপান—একেশ্বরবাদ তার চেয়ে নীচের সোপান। বিচারযুক্তির চেয়েও কল্পনা তোমায় শীঘ্র ও সহজে সেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে।

অন্ততঃ কয়েকজন লোক কেবল ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা করুক, আর সমগ্র জগতের জন্য ধর্ম্ম জিনিসটাকে রক্ষা করুক। 'আমি জনক রাজার মত নির্লিপ্ত' বলে ভান করো না। তুমি জনক বটে, কিন্তু মোহ বা অজ্ঞানের জনকমাত্র। অকপট হয়ে বল 'আমি আদর্শ কি বুঝতে পারছি বটে, কিন্তু এখনও আমি তার কাছে এগুতে পারছি না।' কিন্তু বাস্তবিক ত্যাগ না করে ত্যাগ করবার ভান করো না। যদি বাস্তবিকই ত্যাগ কর, তবে দৃঢ়ভাবে ঐ ত্যাগকে ধরে থাক। লড়াইয়ে একশ লোকের পতন হক না, তবু তুমি ধ্বজা উঠিয়ে নাও এবং এগিয়ে যাও; যেই পড়ুক না কেন, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর সত্য। যাঁর যুদ্ধে পতন হবে, তিনি ধ্বজা অপরের হস্তে

সমর্পণ করে যান—সে সেই ধ্বজা বহন করুক। ধ্বজা যেন ভূমিসাৎ না হয়।

*　　*　　*

বাইবেলে আছে, প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, আর যা কিছু তা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বলি, আমি যখন ধুয়ে পুঁছে পরিষ্কার হলাম, তখন আবার পবিত্রতা, অশুচিতা আমাতে জুড়ে দেবার কি দরকার? বরং আমি বলি, প্রথমেই স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর বাকি যা কিছু সব চলে যাক। তোমাতে নূতন কিছু আসুক—এ অন্বেষণ করো না বরং ঐগুলোকে ত্যাগ করতে পারলেই খুশী হও। ত্যাগ কর, আর জেনো যে তুমি নিজে দেখতে না পেলেও তার ফল এক সময়ে না এক সময়ে ফলবেই। যীশু বারটি জেলে শিষ্য রেখেছিলেন, কিন্তু ঐ অল্প কটি লোকেই প্রবল রোমক সাম্রাজ্য ওলট্‌পালট্ করে দিয়েছিল।

ঈশ্বরের বেদীতে, পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যা কিছু তাই বলিস্বরূপে অর্পণ কর। যিনি ত্যাগের চেষ্টা কখন করেন না, তাঁর চেয়ে যিনি চেষ্টা করেন তিনি ঢের ভাল। একজন ত্যাগীকে দেখলেও তার ফলে হৃদয় পবিত্র হয়। ঈশ্বরকে লাভ করব—কেবল তাঁকেই চাই—এই বলে দৃঢ়পদে দাঁড়াও, দুনিয়া উড়ে যাক; ঈশ্বর ও সংসার—এই দুই-এর মধ্যে কোন আপোষ করতে যেও না। সংসার ত্যাগ কর, তা হলেই কেবল তুমি দেহবন্ধন হতে মুক্ত হতে পারবে। আর ঐরূপে দেহে আসক্তি চলে যাবার পর দেহত্যাগ হলেই তুমি আজাদ্ বা মুক্ত হলে। মুক্ত হও, শুধু দেহের মৃত্যুতে আমাদের কখনও মুক্ত করতে পারে না। বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে। তবেই যখন দেহপাত হবে, তখন সেই মুক্ত পুরুষের পক্ষে আর পুনর্জ্জন্ম হবে না।

সত্যকে সত্যের দ্বারাই বিচার করতে হবে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। লোকের হিত করাই সত্যের কষ্টিপাথর নয়। সূর্য্যকে দেখবার জন্য আর মশালের দরকার করে না। যদি সত্য সমগ্র জগৎকে ধ্বংস করে, তা হলেও তা সত্যই—ঐ সত্য ধরে থাক।

ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলি করা সহজ—তাইতেই সাধারণকে আকর্ষণ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু নেই।

"যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর থেকে জাল বিস্তার করে আবার তাকে নিজের ভিতর গুটিয়ে নেয়, সেইরূপ ঈশ্বরই এই জগৎপ্রপঞ্চ বিস্তার করেন, আবার নিজের ভিতর টেনে নেন!"

* * *

৬ই আগষ্ট, মঙ্গলবার

'আমি' না থাকলে বাইরে 'তুমি' থাকতে পারে না। এই থেকে কতকগুলি দার্শনিক এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমাতেই বাহ্য জগৎ রয়েছে—আমা ছাড়া এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। 'তুমি' কেবল 'আমাতেই' রয়েছ। অপরে আবার ঠিক এর বিপরীত তর্ক করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, 'তুমি' না থাকলে 'আমার' অস্তিত্ব প্রমাণই হতে পারে না। তাঁদের পক্ষেও যুক্তির বল সমান। এই দুটো মতই আংশিক সত্য—খানিকটা সত্য, খানিকটা মিথ্যা। দেহ যেমন জড় ও প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত, চিন্তাও তদ্রূপ। জড় ও মন উভয়ই একটা তৃতীয় পদার্থে অবস্থিত—এক অখণ্ড বস্তু আপনাকে দুভাগ করে ফেলেছে। এই এক অখণ্ড বস্তুর নাম আত্মা।

সেই মূল সত্তা যেন 'ক', সেইটেই মন ও জড় উভয়রূপে আপনাকে

প্রকাশ করছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে এর গতি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী-অবলম্বনে হয়ে থাকে, তাদেরই আমরা নিয়ম বলি। এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে এটি মুক্তস্বভাব, বহু হিসাবে এটি নিয়মের অধীন। তথাপি এই বন্ধন সত্ত্বেও আমাদের ভিতর একটা মুক্তির ধারণা সদাসর্ব্বদা বর্ত্তমান রয়েছে, এরই নাম নিবৃত্তি অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করা। আর বাসনাবশে যে-সব জড়ত্ববিধায়িনী শক্তি আমাদের সংসারিক কার্য্যে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত করে, তাহাদেরই নাম প্রবৃত্তি।

সেই কাজটাকেই নীতিসঙ্গত বা সৎকর্ম্ম বলা যায়, যা আমাদের জড়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। তার বিপরীত যা, তা অসৎ কর্ম্ম। এই জগৎ-প্রপঞ্চকে অনন্ত বোধ হচ্চে, কারণ এর মধ্যে সব জিনিসই চক্রগতিতে চলেছে; যেখান থেকে এসেছে, সেইখানেই ফিরে যাচ্ছে। বৃত্তের রেখাটি চলতে চলতে আবার নিজের সঙ্গে মিলে যায়, সুতরাং এখানে—এই সংসারে—কোনখানে বিশ্রাম বা শান্তি নেই। এই সংসাররূপ বৃত্তের ভিতর থেকে আমাদের বেরুতেই হবে। মুক্তিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র গতি।

* * *

মন্দের কেবল আকার বদলায়, কিন্তু তার গুণগত কোন পরিবর্ত্তন হয় না। প্রাচীনকালে 'জোর যার মুল্লুক তার' ছিল, এখন চালাকি সেই স্থান অধিকার করেছে। দুঃখকষ্ট আমেরিকায় যত তীব্র, ভারতে তত নয়; কারণ এখানে (আমেরিকায়) গরীব লোকে নিজেদের দুরবস্থার সঙ্গে অপরের অবস্থার খুব বেশী প্রভেদ দেখতে পায়।

ভাল মন্দ এই দুটো অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—একটাকে নিতে গেলে অপরটাকে নিতেই হবে। এই জগতের শক্তিসমষ্টি যেন একটা হ্রদের

মত—ওতে যেমন তরঙ্গের উত্থান আছে, ঠিক তদনুযায়ী একটা পতনও আছে। সমষ্টিটা সম্পূর্ণ এক—সুতরাং একজনকে সুখী করা মানেই আর এক জনকে অসুখী করা। বাইরের সুখ জড়সুখ মাত্র, আর তার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট। সুতরাং এককণা সুখও পেতে গেলে, তা অপরের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়ে পাওয়া যায় না। কেবল যা জড়জগতের অতীত সুখ, তা কারও কিছু হানি না করে পাওয়া যেতে পারে। জড়সুখ কেবল জড়দুঃখের রূপান্তর মাত্র।

যারা ঐ তরঙ্গের উত্থানাংশে জন্মেছে ও সেইখানে রয়েছে, তারা তার পতনাংশটা, আর তাতে কি আছে, তা দেখতে পায় না। কখনও মনে করো না, তুমি জগৎকে ভাল ও সুখী করতে পার। ঘানির বলদ তার সামনে বাঁধা গাছ কতক খড় পাবার জন্য চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতে কোন কালে পৌঁছুতে পারে না, কেবল ঘানি ঘোরাতে থাকে মাত্র। আমরাও এইরূপে সদাই সুখরূপ আলেয়ার অনুসরণ করছি—সেটা সর্ব্বদাই আমাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে—আর আমরা শুধু প্রকৃতির ঘানিই ঘোরাচ্ছি। এইরূপ ঘানি টানতে টানতে আমাদের মৃত্যু হল, তারপরে আবার ঘানিটানা আরম্ভ হবে। যদি আমরা অশুভকে দূর করতে পারতাম, তা হলে আমরা কখনই কোন উচ্চতর বস্তুর আভাস পর্য্যন্ত পেতাম না; আমরা তা হলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতাম, কখনও মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করতাম না। যখন মানুষ দেখতে পায়, জড়জগতে সুখের অন্বেষণ একেবারে বৃথা, তখনই ধর্ম্মের আরম্ভ। মানুষের যত রকম জ্ঞান আছে, সবই ধর্ম্মের অঙ্গমাত্র।

মানবদেহে ভালমন্দ এমন সামঞ্জস্য করে রয়েছে যে, তাইতেই মানুষের এ উভয় থেকে মুক্তিলাভ করবার ইচ্ছার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুক্ত যে, সে কোন কালেই বদ্ধ হয় নি। মুক্ত কি করে বদ্ধ হল, এই প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যেখানে কোন বন্ধন নেই, সেখানে কার্য্য-কারণভাবও নেই। "আমি স্বপ্নেতে একটা শেয়াল হয়েছিলাম, আর একটা কুকুর আমায় তাড়া করেছিল।" এখন আমি কি করে প্রশ্ন করতে পারি যে, কেন কুকুর আমায় তাড়া করেছিল? শেয়ালটা স্বপ্নেরই একটা অংশ, আর কুকুরটাও ঐ সঙ্গে আপনা হতেই এসে জুটল; কিন্তু দুই-ই স্বপ্ন, এদের বাহিরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই আমাদের এই বন্ধন অতিক্রম করবার সহায়স্বরূপ। তবে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের চেয়ে প্রাচীন, আর আমাদের এই কুসংস্কার রয়েছে যে, ওটা বিজ্ঞানের চেয়ে পবিত্র। এক হিসাবে পবিত্রও বটে, কারণ ধর্ম্ম নীতি বা চরিত্রকে (morality) তার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে মনে করে, কিন্তু বিজ্ঞান তা করে না।

"পবিত্রাত্মারা ধন্য, কারণ তাঁরা ঈশ্বরকে দর্শন করবেন।" জগতে যদি সব শাস্ত্র এবং সব অবতার লোপ হয়ে যায়, তথাপি এই একমাত্র বাক্যই সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচিয়ে দেবে। অন্তরের এই পবিত্রতা থেকেই ঈশ্বরদর্শন হবে। বিশ্বরূপ সমগ্র সঙ্গীতে এই পবিত্রতাই ধ্বনিত হচ্ছে। পবিত্রতায় কোন বন্ধন নেই। পবিত্রতা দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ দূর করে দাও, তা হলেই আমাদের যথার্থ স্বরূপের প্রকাশ হবে, আর আমরা জানতে পারব আমরা কোন কালে বদ্ধ হই নি। নানাত্বদর্শনই জগতের মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ—সমুদয়কেই আত্মরূপে দর্শন কর ও সকলকেই ভালবাস। ভেদভাব সব একেবারে দূর করে দাও।

* * *

পশুপ্রকৃতি লোকও ক্ষত বা পোড়া ঘার মত আমার দেহেরই একটা

অংশ। তাকে তদ্বির যত্ন করে ভাল করে তুলতে হবে। দুষ্ট লোককেও সেইরকম ক্রমাগত সাহায্য করতে থাক, যতক্ষণ না সে সম্পূর্ণ সেরে যাচ্ছে এবং আবার সুস্থ ও সুখী হচ্ছে।

আমরা যতদিন আপেক্ষিক বা দ্বৈতভূমিতে রয়েছি, ততদিন আমাদের বিশ্বাস করবার অধিকার আছে যে এই আপেক্ষিক জগতের বস্তু দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হতে পারে, আবার ঠিক সেই রকমে সাহায্যও হতে পারে। এই সাহায্যের ভাবটাকেই বিচার করে পৃথক্ করে নিলে যে জিনিস দাঁড়ায়, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি। ঈশ্বর বলতে আমাদের এই ধারণা আসে যে, আমরা যত প্রকার সাহায্য পেতে পারি, তিনি তার সমষ্টিস্বরূপ।

যা-কিছু আমাদের প্রতি করুণাসম্পন্ন, যা-কিছু কল্যাণকর, যা-কিছু আমাদের সহায়ক, ঈশ্বর সেই সকলের সার সমষ্টিস্বরূপ। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র ধারণা থাকা উচিত। আমরা যখন নিজেদের আত্মরূপে ভাবি, তখন আমাদের কোন দেহ নেই, সুতরাং 'আমি ব্রহ্ম, বিষেও আমার কিছু ক্ষতি করতে পারে না',—এই কথাটাই একটা স্ববিরোধী বাক্য। যতক্ষণ আমাদের দেহ রয়েছে, আর সেই দেহটাকে আমরা দেখছি, ততক্ষণ আমাদের ঈশ্বরোপলব্ধি হয় নি। নদীটারই যখন লোপ হল, তখন তার ভিতরের ছোট আবর্তটা কি আর থাকতে পারে? সাহায্যের জন্য কাঁদ দেখি, তা হলে সাহায্য পাবে—আর অবশেষে দেখবে, সাহায্যের জন্য কান্নাও চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যদাতাও চলে গেছেন—খেলা শেষ হয়ে গেছে, বাকি রয়েছেন কেবল আত্মা।

একবার এইটি হয়ে গেলে ফিরে এসে যেমন খুশী খেলা কর। তখন আর এই দেহের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হতে পারে না; কারণ যতদিন

না আমাদের ভিতরে কুপ্রবৃত্তিগুলো সব পুড়ে যাচ্ছে, ততদিন মুক্তিলাভ হবে না। যখন ঐ অবস্থালাভ হয়, তখন আমাদের সব ময়লা পুড়ে যায়, আর অবশিষ্ট থাকে—"জ্যোতিরিব অধূমকম্" ও "দগ্ধেন্ধনমিবানলম্"।

তখন প্রারব্ধ আমাদের দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু তার দ্বারা তখন কেবল ভাল কাজই হতে পারে, কারণ মুক্তিলাভ হবার পূর্ব্বে সব মন্দ চলে গেছে। চোর ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবার সময় তার প্রাক্তনকর্ম্মের ফললাভ করলে।* সে নিশ্চিত পূর্ব্বজন্মে যোগী ছিল, তারপর সে যোগভ্রষ্ট হওয়াতে তাকে জন্মাতে হয়; তার আবার পতন হওয়াতে তাকে পরজন্মে চোর হতে হয়েছিল। কিন্তু ভূতকালে সে যে শুভকর্ম্ম করেছিল, তার ফল ফলল। তার মুক্তিলাভ হবার যখন সময় হল, তখনই তার যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা হল, আর তাঁর এক কথায় সে মুক্ত হয়ে গেল।

বুদ্ধ তাঁর প্রবলতম শত্রুকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কারণ সে ব্যক্তি তাঁকে এত দ্বেষ করত যে, ঐ দ্বেষবশে সে সর্ব্বদা তাঁর চিন্তা করত। ক্রমাগত বুদ্ধের চিন্তায় তার চিত্তশুদ্ধিলাভ হয়েছিল, আর সে মুক্তিলাভ করবার উপযুক্ত হয়েছিল। অতএব সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তা কর, ঐ চিন্তার দ্বারা তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

ইহার পরদিন স্বামীজি নিউইয়র্ক চলিয়া যান।

---

* যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করবার সময় সেই সঙ্গে আর একজন চোরকেও ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল, সে যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করে তাঁর কৃপায় মুক্ত হয়ে গেল—বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত আছে। ঐ ব্যক্তি তার পূর্ব্ব কর্ম্মফলেই যীশুখ্রীষ্টের কৃপালাভ করেছিল।